দ্বিতীয় অধ্যায়

সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমি

সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমি

দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং গণতন্ত্রের উপর আস্থাভাজন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের গৃহীত সাংবিধানিক সিদ্ধান্তগুলিকে বহুমুখী সংকটের মুখে পড়তে দেখা যায় বিশ শতকের সাতের দশকে। একদিকে সরকারের উন্নয়ন মূলক প্রচার, অন্যদিকে কিছুই না পাওয়া জনগণের প্রতিবাদ এই সময়ের রাজনীতিকে জটিল করে তোলে। এই অধ্যায়ে আমরা দেশীয় ও রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) স্তরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসর আলোচনা করে দেখে নেব সাতের দশকের রাজনীতির ইতিহাসকে। গণনার দিক থেকে সাতের দশক ১৯৭০-৭৯ সময়-ক্রমের দশ বছরকে বোঝায়। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথা কখনোই বলা যায় না, সাতের দশকের সূচনা পূর্ববর্তী সময় থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন ছিল। ইতিহাসের যেমন প্রাক্-ইতিহাস আছে, যেখানে ইতিহাস শুরুর বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সে রকমই সাতের দশকের ঘটনারও পরিপাক পূর্বের দশকেই শুরু হয়েছিল। সেজন্য এই রাজনীতির ইতিবৃত্ত আলোচনার শুরু করা হয়েছে ১৯৬৭ সাল থেকে। কারণ ১৯৬৭-৭০ এই সময়ের ব্যবধানে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধির (১৯১৭-১৯৮৪) অভ্যুত্থান ঘটে এবং ক্রমশ নিজেকে কংগ্রেস তথা দেশের সর্বোচ্চ নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এছাড়াও কংগ্রেসের ভাঙন ঘটে কংগ্রেস (আর) ও কংগ্রেস (ও) নামে এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস (আর) ক্ষমতায় আসে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রথম অকংগ্রেসি সরকার 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতায় আসে এবং দার্জিলিঙের নকশালবাড়ি অঞ্চল থেকে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন শুরু হয়; যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের তথা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে এই ঘটনা সমূহের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রবলভাবে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে আমরা দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি—

১. কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত

২. রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ : কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত

দেশীয় রাজনীতিতে সর্বোচ্চ নেত্রীরূপে ইন্দিরা গান্ধির অভ্যুদয় :

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর (১৯০৪-১৯৬৬) মৃত্যুর পর কে. কামরাজ (১৯০৩-১৯৭৫) সহ কংগ্রেস পার্টির সিন্ডিকেটের বাকি সদস্যদের সাহায্যে ইন্দিরা গান্ধি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এর পিছনে অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর আড়ালে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার। আর সেদিক থেকে ইন্দিরা গান্ধি সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব একটা ক্ষমতাবান নন এবং তাঁর নিজস্ব কোনও অনুসারী গোষ্ঠী ছিল না।[১] সিংহাসনে বসেই ইন্দিরা গান্ধিকে খাদ্য সংকট ও অর্থনীতির অবনমন জনিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। দেশজুড়ে চলছে খাদ্য-আন্দোলন। ফলে খাদ্য-সংকট মেটানো ছিল ইন্দিরা গান্ধির প্রথম 'চ্যালেঞ্জ'। সেই সূত্রেই তিনি আমেরিকার সাহায্য আদায়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাহায্যের বিনিময়ে আমেরিকা ও বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে 'টাকা'-র অবমূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সিদ্ধান্তে দলের অন্দরে ও বাহিরে প্রবল বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বিরোধিতা আসে বাম-শিবির থেকে। এমনকি কে. কামরাজও এই সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করেন।[২] ফলে পার্টির অন্দরে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় তা উত্তরোত্তর ইন্দিরা গান্ধিকে রাজনৈতিক বিপাকে ফেলে। 'তিনি (ইন্দিরা গান্ধি) কামরাজ বা পার্টি "বস"দের উপর মোটেই সন্তুষ্ট নন, কিন্তু তাঁদের চটাতেও সাহস পাচ্ছেন না। তিনি পার্টির ভিতরে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান, কিন্তু জনগণের দরবারে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন।'[৩]

এরকম পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (১৯৬৭)। নির্বাচনে কংগ্রেস জিতল ঠিকই, কিন্তু হারাতে হল বেশ কিছু আসন। যেখানে ১৯৬২-র নির্বাচনে মোট ৪৯৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৬১টি আসন[৪], সেখানে ১৯৬৭-র নির্বাচনে ৫২০টি আসনের মধ্যে তা দাঁড়ায় ২৮৩টি আসনে।[৫] সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ আটটি রাজ্যের বিধানসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারাল কংগ্রেস।[৬] তবে এই নির্বাচনে কে. কামরাজ, অতুল্য ঘোষ (১৯০৪-১৯৮৬), এস. কে. পাতিল (১৮৯৮-১৯৮১) সহ এমন অনেক নেতা পরাজিত হয়েছিলেন যাঁরা পূর্বে ইন্দিরা গান্ধির কর্তৃত্বকে 'চ্যালেঞ্জ'-এর মুখে ফেলেছিলেন।[৭] যা পরবর্তী ক্ষেত্রে দলের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধির প্রভাব বিস্তারে

সুবিধা করে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধিকে কিছুটা রাজনৈতিক চাপে রাখার জন্য কামরাজরা মোরারজী দেশাইকে (১৮৯৬-১৯৯৫) নতুন মন্ত্রীসভায় উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ইন্দিরা গান্ধিও বেশি করে মন্ত্রীসভায় নিজের লোক নিয়ে আসেন। যেমন—দীনেশ সিং (১৯২৫-১৯৯৫), পি. গোবিন্দ মেনন (১৯০৬-১৯৭০), কর্ণ সিং (১৯৩১-), ত্রিগুণা সেন (১৯০৫-১৯৯৮) প্রমুখ।[৮]

কে. কামরাজ ও সিণ্ডিকেটের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দিরা গান্ধি নিজেকে জাতীয় নেত্রী হিসেবে গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অকংগ্রেসি দলগুলিকে স্বাগত জানালেন, আবার কংগ্রেসি দলগুলিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় অকংগ্রেসি সরকার আছে তাদের সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দিলেন ঠিকই, আবার গোপনে সেই সমস্ত সরকারকে ভেঙে দেওয়ার কাজ করতেও ছাড়লেন না। এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্তরাও চ্যাবন (১৯১৩-১৯৮৪)।[৯] দ্বিতীয়ত দেশবাসীর মনে প্রতীতি জন্মানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি দেশকে শক্তিশালী করার কাজে উদ্যোগী হয়েছেন।[১০] কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। অবশেষে তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সব দোষ অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর উপর চাপানো হয়।[১১] পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে তখন দুই বামপন্থী সরকার কেন্দ্র-বিরোধিতার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য আদায়ের চেষ্টা করে। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এ বিষয় নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধি ক্রমশ নিজেকে সমাজতন্ত্রী নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে দশ দফা কর্মসূচির কথা বলেন। যেখানে ব্যাঙ্ক, সাধারণ বিমা, বাণিজ্য প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ, ভূমিসংস্কার, রাজন্যভাতার অবলুপ্তি, মূল্যবৃদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জনমুখী কর্মসূচির কথা বলা হয়।[১২] এই ঘোষণা ইন্দিরা গান্ধিকে জনগণের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলে। পাশাপাশি অতি সাবধানে বিভিন্ন রাজ্যের অকংগ্রেসি সরকারগুলিকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চালাতেও তিনি পিছপা হননি। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা।[১৩]

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে কামরাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এস. নিজলিঙ্গাপ্পা (১৯০২-২০০০) পরবর্তী সভাপতি হন।[১৪] কিন্তু তিনি ইন্দিরা গান্ধির তুলনায় বেশি কাছাকাছি ছিলেন সিন্ডিকেটের। অবশ্য তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৬৯ সালে বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়। কিন্তু কোনও রাজ্যে কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না।[১৫] ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেসের মাটি পূর্বের তুলনায় অনেক আলগা হয়ে গেছে। সুতরাং পার্টির অধঃপতন রদ করা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে প্রথম কর্মসূচি হয়ে দাঁড়াল। ইন্দিরা গান্ধিও সেই সুযোগ নিতে ছাড়লেন না।

১৯৬৮-১৯৬৯ সময় পর্বে সিণ্ডিকেটের সদস্যরা ইন্দিরা গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করতে থাকে।[১৬] ইন্দিরা গান্ধি এর আভাস পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁর কিছু করার ছিল না। কারণ লোকসভায় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল এবং পার্টির সংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ ভিত্তি তখনও তৈরি হয়নি। ফলে তিনি খুব সাবধানী পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেন। কংগ্রেসের আদর্শগত অবস্থান কখনও নির্দিষ্ট ছিল না। এখানে বাম-ডান দুই মতাদর্শে বিশ্বাসী সদস্যই ছিল। একরকম 'মধ্য-সাপেক্ষ বাম' ভাবমূর্তি নিয়ে কংগ্রেস চলত।[১৭] কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী যেসব নেতারা ছিলেন, নেহেরু পরবর্তীকালে তাঁরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পা সহ কে. কামরাজ বাদে সিণ্ডিকেটের বাকি সদস্যরা। এঁরা প্রকাশ্যে দক্ষিণপন্থী নীতি গ্রহণের আগ্রহ দেখাতেন।[১৮] কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় বিরোধের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা দেশের কাছে বাড়িয়ে তুলতে ইন্দিরা গান্ধি বারবার নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর পিছনে অবশ্য দলের ভিতরে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী সদস্যদের এবং দেশের বামপন্থী ও অন্যান্য সমাজবাদী দলগুলির কাছে নিজের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনের (১৮৯৭-১৯৬৯) মৃত্যু হয়। প্রয়োজন পড়ে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের। দলের দু'পক্ষই নিজের মনোমত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করতে চাইছিল। কারণ 'দু-পক্ষই রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়টি শুধু মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাই নয়, এমন আশঙ্কাতেও ভুগতে

শুরু করেছেন যে, সংকট মুহূর্তে রাষ্ট্রপতিকে কাজে লাগিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ধরাশায়ী করবার চেষ্টা করবে।'[১৯] ইন্দিরা গান্ধির পছন্দ ছিল শ্রমিক নেতা ভি. ভি. গিরিকে (১৮৯৪-১৯৮০)। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ও সিণ্ডিকেট প্রাক্তন স্পিকার ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জীব রেড্ডীর (১৯১৩-১৯৯৬) নাম প্রস্তাব করল। কিন্তু সঞ্জীব রেড্ডীর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্ক কোনো দিনই ভাল ছিল না।[২০] শেষপর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি জগজীবন রামের (১৯০৮-১৯৮৬) নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধি অর্থনৈতিক প্রস্তাব সম্বলিত বিষয়ক নোট পাঠালেন। যাকে তিনি তাঁর 'বিক্ষিপ্ত ভাবনা' বা 'ইতস্তত চিন্তা' বলেছেন।[২১] এগুলি পূর্বে উল্লিখিত 'দশ দফা নীতি'-র পুনর্কথন। এখানেও একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, সাধারণ বিমা জাতীয়করণ, সম্পত্তির মালিকানার সীমা নির্ধারণ, আমদানি ও খাদ্যশস্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ ইত্যাদি ছিল।[২২] বরুণ সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন—

> 'প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসকে একটা পুরোপুরি সমাজতন্ত্রী পার্টিতে পরিণত করতে হবে। না হলে চলবে না।...একদল লোক সরকার ও দলের ভেতরে থেকেই তাঁর বিভিন্ন প্রগতিশীল কাজের বিরোধিতা করছেন।...আমরা অনেকেই দাবি করি আমরা সমাজতন্ত্রী। কিন্তু আমরা ক'জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমরা সমাজতন্ত্রী? আমাদের মধ্যে ক'জনকে জনগণ সমাজতন্ত্রী বলে মনে করে? আমরা কে সমাজতন্ত্রের জন্য কতটা করেছি?'[২৩]

ইন্দিরা গান্ধি এভাবেই নিজেদের ব্যক্তিগত লড়াইকে আদর্শগত লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ভোটে ৫-২ ব্যবধানে সঞ্জীব রেড্ডী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন।[২৪] এরপর ইন্দিরা গান্ধি তাঁর অবমাননার প্রতিশোধ এবং নিজের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নিলেন। প্রথমেই তিনি মোরারজী দেশাইকে অর্থদপ্তর থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বেসরকারী মালিকানাধীন চোদ্দটি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ করে দিলেন।[২৫] এসম্পর্কে তিনি আকাশবাণীতে বললেন—

> ‘ভারত দেশ হিসেবে অতি প্রাচীন, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে তরুণ। তাকে সদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে যাতে মুষ্টিমেয় লোক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে কবজা করে ফেলতে না পারে।’[২৬]

যদিও সুপ্রিমকোর্ট ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উপর স্থগিতাদেশ দেয়, তবুও এই পদক্ষেপ দেশের মানুষের কাছে এবং বামপন্থী শিবিরে ইন্দিরা গান্ধির গ্রহণ যোগ্যতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

এরপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ায় সঞ্জীব রেড্ডী, ভি. ভি. গিরি দাঁড়ান নির্দল থেকে এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলি দাঁড় করিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে. সুব্বা রাওকে (১৯০২-১৯৭৬)।[২৭] ইন্দিরা গান্ধির সমর্থন কোন দিকে কারও বুঝতে বাকি থাকল না। এই সময় সঞ্জীব রেড্ডীর সমর্থন আদায়ের জন্য নিজলিঙ্গাপ্পা জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির কাছে গেলে ইন্দিরা অনুগামীরা সিণ্ডিকেটের উপর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলে।[২৮] অবশেষে নিজলিঙ্গাপ্পা ইন্দিরা গান্ধিকে সঞ্জীব রেড্ডীর সমর্থনে হুইপ জারি করতে বলেন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে ১৫ আগস্ট ১৯৬৯-এ তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ‘বিবেকের ডাক অনুযায়ী’ ভোট দেওয়ার আহ্বান করেন।[২৯] ২০ আগস্ট ১৯৬৯-এ দেখা যায় ভি. ভি. গিরি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।[৩০] এই জয় ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্ব সত্তার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। তাঁর কূটনৈতিক চাল ও সময় মত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে যোগ্যতার প্রমাণ দিল। দলের অন্দরে ও বাহিরে এবং দেশবাসীর কাছে প্রমাণ হল তিনি অসমসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এরপর ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস পার্টির নতুন মোড় তৈরি হল। কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধিকে ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে’ দল থেকে বহিষ্কার করে দেন।[৩১] ইন্দিরা গান্ধিও এই সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ফলে তাঁকে বহিষ্কার করা হলে কংগ্রেসের দুটি আলাদা অধিবেশন হয়। সিণ্ডিকেটের দ্বারা পরিচালিত অধিবেশন হয় আমেদাবাদে এবং ইন্দিরা গান্ধি দ্বারা পরিচালিত অধিবেশন হয় বোম্বাই-এ। পরিণতিতে কংগ্রেস (আর) ও কংগ্রেস (ও) নামে দুটি পৃথক সংগঠন তৈরি হয়। প্রথমটি ইন্দিরা

গান্ধির নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়টি সিণ্ডিকেটের। 'আর' অর্থে 'রিকুইজিশনিস্ট্স' এবং 'ও' অর্থে 'অর্গানাইজেশন' বোঝানো হয়।[৩২]

কংগ্রেস ভাঙনের পর বেশিরভাগ লোকসভা-সদস্য ইন্দিরার পক্ষে থাকলেও সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল না। যেখানে কংগ্রেস (ও)-র অবস্থান ছিল 'মধ্য-সাপেক্ষ দক্ষিণ' সেখানে কংগ্রেস (আর) আদর্শগত দিক থেকে 'মধ্য-সাপেক্ষ বাম' অবস্থানে ছিল। সেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি, ডি. এম. কে, আকালিদল প্রভৃতির সমর্থনে সরকার টেকানো গিয়েছিল।[৩৩] এরপর ইন্দিরা গান্ধি নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে পূর্বের দশ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতো আর একটি পদক্ষেপ রাজন্যবর্গদের ভাতা ও বিশেষ সুবিধাগুলি বিলোপ করার করার জন্য বিল আনেন। লোকসভায় বিলটি পাস হলেও রাজ্যসভায় গিয়ে আটকে যায়। পরে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দেশবলে রাজন্যবর্গের সুযোগ-সুবিধা তুলে নেয় ঠিকই, কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০ সেই নির্দেশ বাতিল করে দেয়।[৩৪] এভাবে প্রতিটি বিল বাতিল হতে থাকলে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য পার্টির উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল বলে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ লোকসভা ভেঙে দিয়ে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণা করেন।[৩৫]

এই সময়পর্বের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধি প্রথমত, জনগণের কাছে নিজেকে প্রগতিশীল বলে পরিচিত করাতে পেরেছেন; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি একজন দক্ষ নেত্রী এবং কারও হাতের পুতুল হয়ে তিনি থাকার পাত্রী নন তা প্রমাণ করেছেন; তৃতীয়ত, বর্তমানে তিনিই যে সারাদেশে রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছেন বিরোধীদের মনেও সেই প্রতীতি জন্মাতে পেরেছেন; চতুর্থত, রাজনৈতিক কূটনীতির দিক থেকে তিনি যে অপরাজিত তার প্রমাণ দিয়েছেন; পঞ্চমত, কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের অবক্ষয়ের দিনে তিনি পুনরায় কংগ্রেসের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন সে কথা কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী-সমর্থক অনুভব করে, ষষ্ঠত, নেহেরু পরবর্তী সময়ে সিণ্ডিকেটের কয়েকজন নেতার অঙ্গুলি হেলনে কংগ্রেসের সমস্ত কর্মসূচি নির্ধারিত হত—সেখান থেকে পার্টিকে বার করে আনতে পেরেছেন। ফলে ১৯৭১-এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসবের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস (ও), জনসংঘ, স্বতন্ত্র, এস. এস. পি ইত্যাদি অ-কমিউনিস্ট বিরোধী দলগুলি 'মহাজোট' তৈরি করে। ভোটের প্রচারে এঁদের মুল স্লোগান ছিল 'ইন্দিরা হটাও'। যার বিপক্ষে ইন্দিরা-কংগ্রেস আওয়াজ তুলল 'গরিবি হটাও'।[৩৬] কাউন্টার হিসেবে এরকম স্লোগান ছিল এক রাজনৈতিক চাতুর্জের পরিচয়। ইন্দিরা গান্ধি ব্যক্তিগত আক্রমণে গেলেন না। তিনি জনসংঘের সাম্প্রদায়িকতা এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির হিংসায় মদত দেওয়ার মনোভাবকে নির্দিষ্টভাবে আক্রমণ করলেন। প্রচার চালালেন গরিব, ভূমিহীন, তফসিলি ও উপজাতি, মহিলা ও বেকার যুবকদের উদ্দেশ্য। কথা দিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের, উপার্জনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার ইত্যাদি।[৩৭] অবশেষে দেখা গেল ১৯৬৭ সালে যে কংগ্রেস খুব কম ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল, সেখান থেকে তার জনপ্রিয়তা বহুগুন বেড়েছে। মোট আসন পেয়েছে ৫২০টির মধ্যে ৩৫২টি।[৩৮] এই সাফল্যের মূল যে ইন্দিরা গান্ধি তাতে আর সন্দেহ থাকল না। ফলে কংগ্রেসিদের কাছে এতদিনকার অসীম সাহসী প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠলেন 'দেবী দুর্গতিনাশিনী'।[৩৯]

বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ':

সাতের দশকের দেশীয় রাজনীতি আলোচনা শুরুর আগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্তাপ আলোচনা করা প্রয়োজন। দশকের শুরুতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা পরবর্তী সময়ের রাজনীতির অবস্থাই বদলে দিল। দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি মুছে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেশের বিভাজনকেও স্বীকার করতে হয়েছিল। ভারত ভেঙে তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রটি। তবে এর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বিচিত্র। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান—যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী পাঞ্জাবী মুসলমান এবং পূর্বপ্রান্তে ছিল পূর্ব-পাকিস্তান—এখানের অধিবাসীরা মূলত বাঙালি মুসলমান। দু'প্রান্তের বাসিন্দাদের ভাষা-সংস্কৃতি-মনন সব কিছুই ছিল ভিন্ন। তা নিয়ে শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ১৯৭১-এ গিয়ে তা এমন এক জায়গায় পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান বিভাজনের প্রয়োজন পড়ে। প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ'। রাজনীতির এই পটভূমিতে ভারতের সক্রিয় অবস্থান ছিল। যার নেত্রী ছিলেন

ইন্দিরা গান্ধি। ফলে পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা-চরিত্রে ও ভারতীয় রাজনীতিতে এর প্রভাব আসে প্রত্যক্ষভাবে।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ (১৯১৭-১৯৮০) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার আট মাস পরে ২৮ নভেম্বর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন ধার্য হয়।[৪০] নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল মূলত জুলফিকর আলি ভুট্টর (১৯২৮-১৯৭৯) পার্টি পি. পি. পি. (পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি) এবং পূর্ব-পাকিস্তানের শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের ফল প্রকাশে দেখা যায় মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পি. পি. পি. পায় মাত্র ৮৮টি আসন, আর সেখানে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি।[৪১] ফলে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের এই সাফল্য মূলত আসে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। যেখানে পি. পি. পি. একটি আসনেও জয় লাভ করতে পারেনি। অবশ্য এর পিছনে কাজ করেছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ। অ্যান্থনী মাসকারেনহাস তাঁর 'দ্যা রেইপ অফ বাংলাদেশ' গ্রন্থে এই ঔপনিবেশিক শোষণের পরিচয় দিয়েছেন বিশদভাবে। তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর পূর্ব-পাকিস্তানিদের ক্ষিপ্ত হওয়ার চারটি কারণ দেখিয়েছেন—১. রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালিদের অস্বীকার করা, ২. তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানে দীর্ঘ দিনের অনিচ্ছা, ৩. পশ্চিম-পাকিস্তানি কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানিদের করুণার চোখে দেখা এবং ৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য।[৪২] পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১) প্রস্তাব করেন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সম সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে পরিষদ গঠন হবে। কিন্তু তাতে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা গররাজি ছিল।[৪৩] প্রশাসনের উচ্চপদে বাঙালি সংখ্যা ৩৬ শতাংশের বেশি ওঠেনি। ১৯৬৯-এ ইয়াহিয়া খান তাঁর সচিব পদে ১৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিন জন বাঙালি পেয়েছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রেও সেই একই বৈষম্য। ১৯৭০-এ পাকিস্তান বাহিনীতে এক জন মাত্র বাঙালি লেফটানেন্ট জেনারেল ছিলেন। বায়ু ও জল সেনাতেও বাঙালি কখনো সম-মর্যাদা পায়নি।[৪৪] বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করার জন্য তো শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই ঘটে যায়। যা ভাষা-আন্দোলন (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) নামে পরিচিত। সেজন্য ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি আজও 'ভাষা দিবস'

হিসেবে স্বীকৃত। পাকিস্তানের দু'প্রান্তের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল মাত্রাতিরিক্ত। অ্যান্থনী মাসকারেনহাস জানাচ্ছেন—

১. ১৯৬৯-১৯৭০-এ পশ্চিম-পাকিস্তানিদের মাথাপিছু আয় পূর্ব-পাকিস্তানিদের তুলনায় ৬১ শতাংশ বেশি।[৪৫]

২. ১৯৫০-৫৫ সালে উন্নয়ন প্রকল্পে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ২০ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল, সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য ৮০ শতাংশ। ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য সেটা বেড়ে হয় ৩৫ শতাংশ, আর বাকি ৬৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় পশ্চিম-পাকিস্তানে। যেখানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশই পূর্ব-পাকিস্তানে বসবাস করে।[৪৬]

৩. পশ্চিম-পাকিস্তানি রপ্তানি দ্রব্যের ৪০-৫০ শতাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের দখলি বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হত। এবং সেই সমস্ত দ্রব্যের মানও ছিল নিম্ন।[৪৭]

৪. বহির্বিশ্বে পূর্ব-বাংলার উদ্বৃত্ত রপ্তানি আয় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম-পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণে কাজে লাগিয়েছে।[৪৮]

দীর্ঘদিনের এরকম বঞ্চনার ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল এই নির্বাচনে। ফলে তাদের যাবতীয় ভোট পড়ে বাঙালিদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে। নির্বাচনের ফল এটা নির্দিষ্ট করে দিল যে, পরবর্তী সমস্ত ক্ষমতা থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের হাতে। যা পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের পছন্দ হয়নি। আওয়ামী লীগের দাবি ছিল ছয় দফা নীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করা। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা, স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল।[৪৯] যা মেনে নিতে পারেনি ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো।

শেখ মুজিবুর প্রথম থেকেই আলোচনার পথ খোলা রেখেছিলেন। কিন্তু নানা টালবাহানার মাধ্যমে পরিষদ গঠন এড়িয়ে যায় ইয়াহিয়া গোষ্ঠী। অবশেষে ১ মার্চ বেতার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার কথা।[৫০] এই ঘোষণায় জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আর পূর্ব-পাকিস্তানে সংকট ক্রমশ নাশকতার দিকে এগোতে থাকে। ১১০ নং সামরিক আইন জারি করে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে

আনার চেষ্টা করে এবং জনগণের আন্দোলন রদ করার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়।[৫১] কিন্তু জনগণ তা অমান্য করে নিজেদের প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে গেলে সেনা বাহিনীর গুলিতে বহু মানুষ মারা যায়। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর এরকম পাশবিক আচরণের কঠোর নিন্দা করেন মুজিবুর। এর প্রতিবাদে তিনি গ্রহণ করেন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পদক্ষেপ। আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে তিনি বলেন, ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে; সকল প্রকার অফিস, কোর্ট-কাছারি, বাজার, পরিবহন ইত্যাদি বন্ধ থাকবে।[৫২] ৬ মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঘোষণা করলে মুজিবুর ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে চারটি পূর্ব-শর্ত রাখেন—১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, ২. সেনাকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৩. নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং ৪. গণহত্যার উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে।[৫৩] এই সমাবেশে লক্ষাধিক লোক জড়ো হয়েছিল। এই দিনই তিনি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের দশ দফা নীতি ঘোষণা করেন। যেমন—সকল প্রকার কর বন্ধ করা, সরকারি অফিস আদালতে হরতাল পালিত করা, সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগ করা, রেডিও, টেলিভিশনে আন্দোলনের সংবাদ প্রচার না করলে সেখানকার বাঙালি কর্মচারীরা অসহযোগিতা করবে, শুধুমাত্র অন্তঃজেলা টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, পূর্ব-পাকিস্তানের টাকা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না, সকল গৃহে ও প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে ইত্যাদি।[৫৪] আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আওতায় চলে আসে। তাতে শঙ্কিত হয়ে শেষে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তর সূত্রে দফায় দফায় মুজিবুর-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। যদিও তার কোনও সদর্থক ফল হয়নি। এজন্যই ২২ মার্চ বৈঠক শেষে পুনরায় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়।[৫৫] এর মধ্যে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, ১৯ মার্চ বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুজিবুর রহমান জানতে পারে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সেনা বাহিনী গুলি করে বহু লোককে হত্যা করেছে।[৫৬] এরকম উত্তাল পরিস্থিতিতে ২৩ মার্চ বহু জায়গায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়।[৫৭] বুঝতে বাকি থাকল না যে গতি কোন দিকে। ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর

গুলিতে প্রায় ১৫০ জন মারা যায়। সেদিনই রাতে পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করেন ইয়াহিয়া আর ভুট্ট।[৫৮]

পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইয়াহিয়া খাঁর নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বাগত জানালেও, পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই 'জাতীয় মুক্তি নির্বাচনে আসতে পারে না' এই অভিমত প্রকাশ করতে থাকে এবং জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার। সেই অনুসারে ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পল্টনের এক জনসভায় মাহাবুব-উল্লার নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানকে 'স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করে ১১ দফা সম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৫৯] কিন্তু পরে পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক লাইনগত বিভিন্ন সমস্যার কারণে কতগুলি গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়—

১. হক-তোয়াহা গ্রুপ—'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)' নাম দিয়ে এরা পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লবের পরিকল্পনা করে।

২. সিরাজ-শিকদার গ্রুপ—'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নাম দিয়ে এরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে চায়।

৩. জাফর-মেনন গ্রুপ—'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি' নাম দিয়ে এরা বলেন, 'পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজির জাতিগত নিপীড়ন চলছে এবং ঘটনা চক্রে এই বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছে।'[৬০]

৪. মতিন-আলাউদ্দিন-দেবেন-বাসার গ্রুপ—'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' নামে পরিচিত এই গ্রুপ মনে করে, পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ জনগণ কৃষক এবং তারা সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত। সুতরাং পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সামন্তবাদী শোষণই মূল দ্বন্দ্ব। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণও বৃহৎ রূপ ধারণ করেছে। সেজন্য তারা একই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এবং জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এক সঙ্গে চালাতে চেয়েছে।[৬১]

১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের এই চারটি কমিউনিস্ট গ্রুপ অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ১৯৭১-এর ২ মার্চ যখন পাকিস্তানের সেনা পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং তার প্রতিবাদে মুজিবুর রহমান অহিংস-অসহযোগের ডাক দেয় তখন কমিউনিস্ট পার্টি পুর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে সশস্ত্র সেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়। তারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার কথা বলে। সেই উদ্দেশ্যে ৬ মার্চ স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, দেশপ্রেমিক জাতীয় পুঁজিপতিদের সমন্বয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গড়ার ডাক দেয় এবং 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফৌজ' গঠনের উপর গুরুত্ব দেয়।[৬২] ৯ মার্চ পল্টনের ময়দানে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) কমিউনিস্টদের এই পদক্ষেপের সমর্থন এবং মুজিবের অহিংস-অসহযোগের বিরোধিতা করেন।[৬৩] মুজিবুর রহমানের চারটি পূর্ব-শর্ত এবং ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে যখন ইয়াহিয়া-মুজিবের আলাপ আলোচনা চলে তখন তার প্রতিবাদে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ ও ছাত্র সম্প্রদায় প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা করে এবং স্লোগান তোলে—'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত দিয়েছি আরো দেবো বাংলা দেশ স্বাধীন করো', 'এবারের রক্ত স্বাধীনতার রক্ত', 'খুনির সাথে আপোষ আলোচনা চলবে না চলবে না' ইত্যাদি।[৬৪]

২৫ মার্চ মধ্য রাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় চলে নৃশংস ও পৈশাচিক গণহত্যা। প্রথম 'টারগেট' করা হয় ছাত্র-সমাজকে। ছাত্রদের হস্টেল 'ইকবাল হল' এবং 'জগন্নাথ হল'-এ পাকিস্তানি সেনারা সকল আবাসিক ছাত্রদের হত্যা করে। বাদ গেল না ছাত্রীরাও—'রোকেয়া হল'-এ সৈন্যরা আবাসিক ছাত্রীদের ধর্ষণ করতে থাকে। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে অনেকে ছাদ থেকে লাফিয়ে প্রাণ দেয়।[৬৫] এর থেকে বেশি মানবতার অপমান ও লজ্জা আর কী হতে পারে! দ্বিতীয় 'টারগেট' করে রাজারবাগে পূর্ব-পাকিস্তান পুলিশের সদর দপ্তর। সেখানে ১১০০ পুলিশ হত্যা করে।[৬৬] এছাড়াও সর্বত্র হত্যালীলা চলে। সেই রাত্রেই মুজিবুর রহমানকেও গ্রেপ্তার করে পশ্চিম-পাকিস্তানে নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যালঘু বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন কিছু বাঙালি অফিসার ও সৈন্য সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে মেজর জিয়াউর রহমানের (১৯৭৭-১৯৮১) 'স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন এবং ২৮

মার্চ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়।[৬৭] ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এই মাসেই কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর (১৯১৮-১৯৮৪) অধিনায়কত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, মুজাহিদ বাহিনীর সশস্ত্র ও প্রাক্তন সৈনিক, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করা হয়।[৬৮] এই বাহিনী পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'গেরিলা' পদ্ধতিতে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। আর অপরদিকে পাকিস্তানি সেনা লড়াই করার জন্য 'রাজাকার বাহিনী' তৈরি করে 'অপারেশন সার্চলাইট' করে।

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগদান ছিল। ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে পারত না। মুজিবনগরে তাজউদ্দীন আহমেদ (১৯২৫-১৯৭৫)-এর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলার সরকার বাংলাদেশে শপথ নিলেও সেসময় তাদের কার্জ পরিচালনার জন্য প্রধান দপ্তর করতে হয় কলকাতায়, থিয়েটার রোডে।[৬৯] এছাড়াও মুক্তিবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে প্রথম থেকেই ভারত সাহায্য করেছে। ভারতের বিশেষ ভূমিকা থাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনার হত্যালীলা থেকে বহু জনগণ প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয়ের সন্ধানে আসতে থাকে। এপ্রিল থেকে সেই আগমন শুরু হয় এবং ডিসেম্বর অর্থৎ নিজেদের দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে। নয় মাস ব্যাপী সময়ে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী ভারতের বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে আশ্রয় নেয়।[৭০] গড়ে তোলা হয় উদ্বাস্ত শিবির। কিন্তু বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণ করা একা ভারতের পক্ষে কঠিন ছিল। সেজন্য ভারতের রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদরা বিশ্বের সামনে উদ্বাস্তু সংকট তুলে ধরেন। ইন্দিরা গান্ধি সে ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেন। কিন্তু বাইরে থেকে তেমন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে ভারতকে বিশাল আর্থিক বোঝা বইতে হয়েছে। নিজেদের বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়ন ও সমাজ কল্যানের কর্মসূচি কমিয়ে, নতুন কর বসিয়ে ও বাণিজ্যিক ঋণ নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে।[৭১] পরিস্থিতি যদি যুদ্ধের দিকে গড়ায় সেজন্য ৯ আগষ্ট কুড়ি বছর মেয়াদি ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি সাক্ষরিত হয়। যেখানে বলা হয়, কোনো দেশ (ভারত

ও রাশিয়া) যদি আক্রমণের মুখে পড়ে তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য উভয়ে আলোচনায় বসে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।[৭২] সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর-এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধি রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকা সফরে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। কিন্তু আমেরিকা ও চিন প্রথম থেকেই সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের পক্ষেই থেকেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ যুদ্ধের দিকে এগোয়। অবশেষে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত আটটি বিমানঘাঁটিতে আঘাত করে। ভারত সরকারও প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয়। তেরো দিনের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনা আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়।

ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা-কংগ্রেসের প্রথম যুগ (১৯৭১-১৯৭৫) :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্ব সত্তার জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই সুযোগটা তিনি প্রয়োগ করলেন ১৯৭২ সালে কতগুলি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। ১৯৭১-এ সংবিধানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়—২৪ ও ২৫ তম। ১৯৫১ ও ১৯৬৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট সম্পত্তির ওপর জনগণের মৌলিক অধিকারকে পার্লামেন্ট কর্তৃক সংশোধন করার ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু ১৯৬৭-তে 'গোলকনাথ মামলা'-র ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা বাতিল হয়ে যায়। ২৪ তম সংশোধনে পুনরায় পার্লামেন্টের হৃত ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা হয়। আর ২৫ তম সংশোধনে বলা হল, সরকারি কাজে অধিগ্রহণ করা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ মূল্য কত দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করার সমস্ত ক্ষমতাই থাকবে পার্লামেন্টের ওপর। পার্লামেন্টের ধার্য করা ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয় বলে সুপ্রিমকোর্টে মামলাও করা যাবে না—এ কথাও সংশোধনে বলা হয়।[৭৩] এভাবে বিচার ব্যবস্থার ক্ষমতাকে খর্ব করে উত্তরোত্তর পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পথে হাঁটে ইন্দিরা-কংগ্রেস সরকার।

১৯৭১-এর নির্বাচনের সময় তিনি যে অর্থনৈতিক অগ্রসরতা, সামাজিক মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণের সময় এল।

কারণ পাকিস্তান সমস্যার সমাধান হয়েছে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার পরিচয় যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে, দেশে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার আছে, জনমানসের মধ্যেও ইন্দিরা গান্ধির প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যথেষ্ট। সুতরাং কোনও সিদ্ধান্ত নিতে বা নিজের এজেন্ডা পূর্ণ করতে তাঁর আর তেমন কোনও বাধা নেই। কিন্তু ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত কোনও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঘটানোর অনেকটাই দায়িত্ব থাকে রাজ্য-সরকারের ওপর। সুতরাং সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্য-ক্ষমতার ওপরও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ চায় বলে ইন্দিরা-কংগ্রেস মনে করে। ফলে মার্চ ১৯৭২-এ উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং ওড়িশা বাদে বাকি সমস্ত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সবকটি রাজ্যেই কংগ্রেস জয়ী হয়।[৭৪] সুতরাং কংগ্রেসের মতানুযায়ী উন্নয়নের পথের অন্তিম বাধাটুকুও আর থাকল না। অর্থাৎ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কংগ্রেস আরও দায়বদ্ধ হয়ে পড়ল।

সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এবং নিজের মধ্য-বামপন্থা নীতির বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য ইন্দিরা গান্ধির সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পূর্বের জাতীয়করণ নীতি অনুসারেই সাধারণ বিমা জাতীয়করণ করা হয় আগস্ট ১৯৭২-এ, তার কিছু পরেই কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করে। 'Foreign Exchange Regulation Act' ১৯৭৩ সালে পাস করে বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা হয়। শিল্প যাতে মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পপতির কুক্ষিগত না হয়ে যায় সেজন্য ১৯৬৯ সালে যে 'The Monopoly and Restrictive Trade Practices Act' আইন জারি হয়েছিল, ১৯৭১-এ এসে তা কার্যে রূপায়ণ করা হল। কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরের বাম-মনস্ক সদস্যগণ দেশীয় শিল্পে আরও বেশি করে জাতীয়করণ নীতি প্রয়োগ করার চাপ দিচ্ছিল, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সে পথে আর বেশি দূর এগোলেন না। কারণ তিনি ভারতবর্ষকে একটি মিশ্র অর্থনীতির দেশে পরিণত করতে চাইলেন।[৭৫]

এসব সত্ত্বেও সাতের দশকের শুরু থেকেই দেশের অর্থনৈতিক গতি ক্রমশ নিচের দিকে। যেখানে ১৯৫৪-১৯৬৪ সময়পর্বে দেশের জাতীয় আয় ৪.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে ১৯৬৭-১৯৭৩ সময়পর্বে দাঁড়ায় ২.৯ শতাংশতে। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার ও বিনিয়োগের মাত্রা পূর্বের তুলনায় ক্রমশ নিম্নগতি ছিল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে একদিকে সামরিক যুদ্ধ করতে

হয়েছিল এবং অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগণকে আশ্রয় দিতে হয়েছিল। সেজন্য বিপুল পরিমাণের সঞ্চিত খাদ্যশস্য ও অর্থ খরচ হয়। যার প্রভাবও পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিতে পড়ে। তার উপর ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে পর পর দু'বছর দেশের বিভিন্ন অংশে খরা দেখা দেওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় আবার এল ১৯৭৩ সালের কুখ্যাত তৈল্য-ধাক্কা। তৈল-উৎপাদক দেশগুলি অশোধিত তৈল উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববাজারে অশোধিত তৈলের দাম পূর্বের তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। অশোধিত তেলের জন্য ভারত যেহেতু পুরোপুরি আমদানির উপর নির্ভরশীল, সেহেতু দেশে দেখা দিল পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে। দেশের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়ে, বাজেটের ঘাটতি হয়। পরিবহণের খরচ আরও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য বাড়তেই থাকে। ১৯৭২-১৯৭৩-এই মূল্যবৃদ্ধি ছিল ২২ শতাংশ, ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি তা ৩০ শতাংশতে গিয়ে দাঁড়ায়। যা স্বাধীনতা পরবর্তীতে সব থেকে বেশি ছিল। চাল, গম, ডাল-এর মত নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য যার মধ্যে ছিল। ফলে কেবলমাত্র গরিব নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণিও চিন্তায় পড়েছিল।[৭৬] অপরদিকে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিনিয়ত বর্ধিত হচ্ছিল। ১৯৬৬ সালে টাটার সম্পত্তি যেখানে ৫০৫ কোটি টাকার ছিল সেখানে ১৯৭০-এর মাঝামাঝি ৬৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিড়লার সম্পত্তি ৪৫৮ কোটি থেকে ৬২৯ কোটি টাকায়, মফতলালদের ৯৩ কোটি থেকে ১৫৬ কোটি টাকায় পৌঁছায়।[৭৭] এরকম মন্দার দিনে বাড়তে থাকে অসাধু ব্যবসায়ীদের দাপট, কালোবাজারির রমরমা। সাধারণ মানুষ এসব ক্ষেত্রে দায়ী করতে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিদের। কংগ্রেসের জনসমর্থন শহর অঞ্চলে ক্রমশ কমতে থাকে। 'গরিবি হটাও' শ্লোগানের সূত্র ধরে কেউ কেউ তো বলতে শুরু করে, সরকার 'গরিবি' নয়, 'গরিব'-দের হটানো শুরু করেছে।

অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছিল। সংগঠনগত দিক থেকে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করেছিল। ১৯৭৪-১৯৭৫-এর দিকে এই সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছিল কংগ্রেসের রাজ্য ও তৃণমূল স্তরে। এমন কিছু কংগ্রেস নেতার আবির্ভাব ঘটে যারা দলের উন্নতির চেয়ে নিজেদের আত্মিক সাধনেই অধিক তৎপর থাকে। এর পিছনে কাজ করেছিল অবশ্য

পার্টির সমস্ত ক্ষমতা ইন্দিরা গান্ধির নিজের হাতে রাখার প্রবণতা। কংগ্রেস দলের মধ্যে যে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো ছিল, নিজেদের নেতাদের দলের কর্মীরা চয়ন করতে পারত, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিকশিত এবং পরে নেহেরুর দ্বারা লালিত হয়েছিল, তিনি তা ধ্বংস করেন। নিজের খেয়াল-খুশি মতো, নিজের পছন্দের লোকেদের মুখ্যমন্ত্রী ও দলের বিভিন্ন পদে বসাতেন—তাতে তাদের সাংগঠনিক ভূমিকা বা লোকপ্রিয়তা থাক বা না থাক।[৭৮] দেশের সর্বস্তরে দুর্নীতি দেখা দিতে শুরু করেছিল। দুর্নীতির আঁচ প্রধানমন্ত্রীকে স্পর্শ করতেও ছাড়ল না। যখন শিল্প মন্ত্রকের দপ্তর থেকে আঠারো জন আবেদন কর্তার মধ্যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধি বছরে ৫০,০০০ মারুতি গাড়ি তৈরি করার অনুমতি পেল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও। হরিয়ানার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল এই প্রকল্পের জন্য বাজারদর থেকে অনেক কম মূল্যে গুরুগ্রামের কাছে ২৯০ একর জমিও তাকে দিল।[৭৯]

এই সময় আর একটা নতুন বিষয়ে বিতর্ক বাঁধল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সূত্রে। হঠাৎ করে ১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে অজিতনারায়ণ রায়-কে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসর গ্রহণ করলে বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে যিনি প্রবীণতম তিনি প্রধান বিচারপতি হন। সেই দিক থেকে অজিতনারায়ণ রায়ের আগে আরও তিনজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ছিলেন—শেলট, হেগড়ে, গ্রোভার। এর প্রতিবাদে পরে তিনজনই পদত্যাগ করেছিল। অজিতনারায়ণ রায়ের এরকম নিয়োগের পিছনে অবশ্য রাজনীতি কাজ করেছিল। এতদিন পর্যন্ত সরকারের সমস্ত পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্ট বাধা দিচ্ছিল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিকূলে সুপ্রিম কোর্টের রায় গিয়েছিল। ফলে সরকার বারবার সংবিধান সংশোধন করে। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে সংবিধানের এরকম অত্যধিক সংশোধন সংসদ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা হয়। তেরো জন বিচারপতির বেঞ্চ হয়েছিল এর জন্য। ছয় জন রায় দেয় সরকারের বিপক্ষে এবং সাত জন রায় দেয় পক্ষে। সেই সাত জনের একজন অজিতনারায়ণ রায়, বাকি তিন জনই ছিল বিপক্ষে। সুপ্রিম কোর্টের এরকম বিচারপতি নিয়োগ প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিল। এই কাজের বিশেষভাবে সমালোচনা করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।[৮০]

জাতীয় জীবনে এরকম সংকট ঘনীভূত হতে থাকলে ধাক্কা লাগে ইন্দিরা গান্ধির সমাজতান্ত্রিক ইমেজের উপর। দেশের অর্থনীতির অবনমন, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, আকাশচুম্বী দুর্নীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির জটিলতা সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করছিল। সেই ক্ষোভ থেকে ক্রমশ বৃহত্তর আন্দোলনের ভূমি তৈরি হচ্ছিল। দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলগুলিতে অসন্তোষ লেগেই ছিল। বোনাসের দাবিতে, বেতন সঙ্কচন, কর্মী ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন হতেই থাকত। আন্দোলনের তীব্রতা ১৯৭৪ সালের দিকে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে প্রায় ৪০.৬২ মিলিয়ন শ্রমদিবস বিনষ্ট হয়েছিল। যা ১৯৭৩-এ বিনষ্ট হওয়া ২০.২৬ মিনিয়ন শ্রমদিবসের দ্বিগুন।[৮১] এরকম টুকরো টুকরো ঘটনা বারবার সরকারকে বিপাকে ফেলছিল। তবে এই দশকে কংগ্রেস সরকারকে সবথেকে বড় ধাক্কা দেয় ১৯৭৪ সালের গুজরাটের ও বিহারের আন্দোলন।

৩ জানুয়ারি ১৯৭৪, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, হস্টেলে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে গুজরাটে 'নবনির্মাণ' ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। অচিরেই তার সঙ্গে যোগদান করে বিরোধী নেতৃত্বরা ও সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগণ। অভিযোগের আঙুল ওঠে মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের দিকে এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল সরকারের অপসারণ। গুজরাট জুড়ে তৈরি হল অচলাবস্থা—ধর্মঘট, বন্ধ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ঘটল নানা জায়গায়। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পুলিশও বলপ্রয়োগ করে। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শেষপর্যন্ত ৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র সরকার গুজরাট সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। ১১ ফেব্রুয়ারি জয়প্রকাশ নারায়ণ আমেদাবাদে এসে আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, দেশের অন্যান্য প্রান্তের যুবকদের কাছে এটি একটি উদাহরণ।[৮২] কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আন্দোলন চলে এপ্রিল পর্যন্ত। বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের দাবিতে একটানা আন্দোলন এবং মোরারজি দেশাইয়ের আমরণ অনশনের চাপে অবশেষে ১৯৭৫-এর জুন মাসে নির্বাচন ঘোষণা করেন।[৮৩] এই দশকে প্রথম আন্দোলন নিজের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। অবশ্য 'নবনির্মান যুবক সমিতি' আন্দোলনকে অহিংস রাখার কথা বলে, কিন্তু প্রায় তাতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটত এবং তা দমন করতে

প্রশাসনকেও কড়া পদক্ষেপ নিতে হত। গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, গুলি চালানো কিছুই বাদ থাকত না। ফলে একশোর অধিক জনগণ মারা যায়, ৩০০০-এর বেশি আহত হয় এবং ৮০০০-এর বেশি গ্রেপ্তার হয়।[৮৪]

গুজরাটের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে বিহারেও অনুরূপ আন্দোলন সংগটিত হয় মার্চ মাসে। বিহার এই সময় অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে, রাজনীতিতে হিংসায় পরিপূর্ণ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে ৩ বার রাষ্ট্রপতি শাসন দেখেছে এ রাজ্য। অসামাজিক কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, জাতিগত অত্যাচার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে দীর্ণ। ফলে সমস্ত দিক থেকেই বিহারে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত 'বিহার রাজ্য মাহাঙ্গি অভাভ পেশা কর বিরোধী মজদুর স্ব কর্মচারী সংঘর্ষ সমিতি'-এই দীর্ঘ নামের একটি জোট ১৯৭৩ সালের শেষ সপ্তাহ থেকেই খাদ্য ও কাজের দাবিতে বিক্ষোভ করছিল।[৮৫] সেই রেষারেষি অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট ছাত্র-সংগঠনগুলি 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি' নামে একটি জোট তৈরি করে এবং বিধানসভা ঘেরাও করে ১৮ মার্চ ১৯৭৪।[৮৬] অশান্ত হয় শহরের বিভিন্ন অঞ্চল। এরকম পরিস্থিতি চলে এক সপ্তাহের বেশি। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ সক্রিয় হয়, সান্ধ্য আইন জারি হয়, মারা যায় ২৭ জন।[৮৭] এরপর ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে রাজি হন জয়প্রকাশ নারায়ণ। আসলে দীর্ঘদিন ধরে দেশের সার্বিক অবস্থার অবনমন দেখে তিনিও ক্ষিপ্ত ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক থেকেছেন, ক্ষমতার লোভে নিজেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের কল্যাণকর ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকার দরুন তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল বিপুল। ফলে তাঁর যোগদান আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তিনি 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'-র ডাক দিলেন। নির্ভর করলেন ছাত্র-যুবশক্তির উপর। এরপর থেকেই 'বিহার আন্দোলন' ক্রমশ হয়ে ওঠে 'জে পি আন্দোলন'।[৮৮]

জে পি আন্দোলন চলাকালীন দেশে ঘটে যাওয়া কতগুলি ঘটনা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মানোন্নয়নের দাবিতে সোশ্যালিস্ট জর্জ ফার্নান্ডেজের (১৯৩০-২০১৯) নেতৃত্বে ৮ মে ১৯৭৪ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশব্যাপী রেল-ধর্মঘট ডাকা হয়। সরকার প্রথমেই এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে ধর্মঘট ভাঙার জন্য প্রচণ্ড

দমন-পীড়নের পথ নেয়। ৫০ হাজারের উপর রেল শ্রমিক ও কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়, ৩০ হাজার কর্মচারীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়, রেল কলোনিগুলিতে কার্ফু জারি করে পুলিশি সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে।[৮৯] অবশেষে অত্যধিক দমন-পীড়নে ২১ দিন পর বাধ্য হয়ে ২৯ মে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যখন দেশজুড়ে জনগণ ইন্দিরা-বিমুখ হয়ে উঠেছে তখন ইন্দিরা গান্ধি তৎপরতার সঙ্গে ধর্মঘট চলার মাঝেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেশে জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে নিজের ইমেজ শক্তিশালী করার চেষ্টা করলেন। এই বিস্ফোরণ ইন্দিরা গান্ধিকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও এসময় জে পি আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিহারে। অনেকে এই আন্দোলনকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলতেও শুরু করে।[৯০] ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র বিহারের সমস্তিপুরে বোমা বিস্ফোরণে খুন হন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তিনি ছিলেন দলের অর্থসংগ্রাহক। দেশের বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে তিনি ১৯৭১ ও ১৯৭২-এর নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর হত্যা রহস্যের আসল সত্য এখনও উদ্ঘাটন হয়নি। প্রধানমন্ত্রী এর জন্য দায়ী করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর আন্দোলনকে।[৯১] কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের সর্বত্র; বিশেষ করে উত্তর-ভারতে। কংগ্রেস বিরোধী অ-বামপন্থী দলগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের মধ্যেও অন্তর্দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিক থেকেই জয়প্রকাশ ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন। সর্বত্রই তিনি বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন।[৯২] ৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দিল্লিতে সংসদ ভবন অভিযান হয়। লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সামনে দাবিপত্র পেশ করা হয়। যেখানে প্রধান দাবিগুলি ছিল, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় যে জরুরি অবস্থা (বহিঃ) জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে হবে, বিহার ও গুজরাটের (গুজরাটে তখনও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ছিল) পুনর্নির্বাচন করাতে হবে, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে, নির্বাচনে অর্থশক্তির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। এই অভিযানে কয়েক লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করেছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ সেজন্য এই অভিযানকে গান্ধির ডাণ্ডি অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[৯৩]

১২ জুন ১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতি একটা অপ্রত্যাশিত বাঁক নেয়। বিচারপতি জগমোহন সিংহর (১৯২০-২০০৮) এজলাসে ১৯৭১ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা রাজ নারায়ণের (১৯১৭-১৯৮৬) দায়ের করা একটি মামলার বিচারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দোষী সাব্যস্ত হন। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরিলিতে রাজ নারায়ণ ইন্দিরা গান্ধির বিপক্ষে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। মামলা করা হয়েছিল এই নিমিত্তে যে, ইন্দিরা গান্ধি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সেই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। ফলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে তাঁর নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রী পদ বাতিল হয়ে যায় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি পরবর্তী ছয় বছর সংসদীয় নির্বাচনে দাঁড়াতে এবং কোনো রকম নির্বাচিত পদে বহাল থাকতে পারবেন না।[৯৪] তবে তিনি চাইলে এই মামলার পুনর্বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্টে আপিল করতে পারেন। সেজন্য তাঁকে কুড়ি দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। সেদিনই আবার অন্যদিকে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়; যেখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে 'জনতাফ্রন্ট'-এর কাছে পরাজিত হয়।[৯৫] ১৪ তারিখ এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হল এবং ২৪ তারিখ বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ারের (১৯১৫-২০১৪) এজলাসে শুনানি হয়। ইন্দিরা গান্ধি এই রায়ের সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তা না করে রায় দেয় এই মর্মে যে, যতদিন না এই মামলার সর্বোচ্চ শুনানি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকতে পারেন এবং সংসদের অধিবেশনেও যোগদান করতে পারবেন; কিন্তু কোনো রকম ভোট দিতে পারবেন না।[৯৬]

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে ইন্দিরা-বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা উৎসাহ পায়। তাঁরা সুপ্রিমকোর্টের রায়ের অপেক্ষা না করেই স্থির করেন দেশজুড়ে ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগের দাবিতে গণ-আন্দোলন করবে। সেই মতো দিল্লিতে পরপর কতগুলি বিরোধ মিছিল হয়, রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ধর্ণা বসে। সি পি আই (এম) আন্দোলনে যোগদান করেনি কিন্তু দাবির সমর্থন করেছিল।[৯৭] আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনসংঘ, কংগ্রেস (ও), ভারতীয় লোকদল, সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং আকালি দল সম্মিলিত হয়ে 'জনতাফ্রন্ট' বা 'জনমোর্চা' গঠন করে। এই সময় অপরদিকে ইন্দিরা গান্ধির অনুগামীরাও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা প্রকাশ করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি

দেবকান্ত বড়ুয়ার (১৯১৪-১৯৯৬) নেতৃত্বে ১৮ জুন এক সভায় কংগ্রেস সাংসদরা ইন্দিরা গান্ধির প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। তবে এখানে চন্দ্র শেখর (১৯২৭-২০০৭), কৃষ্ণ কান্ত (১৯২৭-২০০২), মোহন ধারিয়া (১৯২৫-২০১৩), লক্ষ্মী কান্তাম্মা (১৯২৪-২০০৭) এবং রাম ধন (১৯২১-২০০১) সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সভাতেই দেবকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'Indira is India and India is indira', ঠিক যেমন নাজিরা হিটলার সম্পর্কে বলত, 'Germany is Hitler and Hitlar is Germany'।[৯৮] সুপ্রিমকোর্টের রায় পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। ২৫ জুন জনমোর্চার সদস্যরা দিল্লিতে সমবেত হন, সেখানে উপস্থিত থাকেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। প্রতিষ্ঠা করেন 'লোক সংঘর্ষ সমিতি'। তাঁরা ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ২৯ জুন থেকে দেশজুড়ে আন্দোলন করা হবে।[৯৯] এরকম রাজনৈতিক চক্রব্যূহের মধ্যে নিজের ক্ষমতা বাঁচাতে ইন্দিরা গান্ধি শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মারফত হঠাৎ করেই দেশে সংবিধানের ৩৫২ (ক) নং ধারা অনুযায়ী দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করেন।

জরুরি অবস্থার কাল (১৯৭৫-১৯৭৭) :

রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—

> 'by this Proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances.'[১০০]

২৬ জুন আকাশবাণীতে জরুরি অবস্থার সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—

> 'The President has proclaimed the emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy, which has been brewing ever since I began to introduce certain progressive measures of benefit to the common man

> and woman of India. In the name of democracy, it has been sought to negate the very functioning of democracy...Certain persons have gone to the length of inciting our armed forces to mutiny and our police to rebel...The forces of disintegration are in full play and communal passions are being aroused, threatening our unity...This is not a personal matter. It is not important whether I remain Prime Minister or not. However, the institution of the Prime Minister is important and the deliberate political attempts to denigrate it is not in the interest of democracy or of the nation...I am sure that internal conditions will speedily improve to enable us to dispense with this proclamation as soon as possible.'[১০১]

এছাড়াও 'সানডে টাইমস', 'স্যাটারডে রিভিউ' ইত্যাদি একাধিক সাক্ষাৎকারে জরুরি অবস্থার সমর্থনে যুক্তি দেখান যে, গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্যই তাঁর এই পদক্ষেপ।[১০২] এখন জরুরি অবস্থার সময় পর্বকে বিচার করে দেখা যেতে পারে ইন্দিরা গান্ধির বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, দেশজুড়ে বিরোধী নেতা, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মী এবং প্রতিবাদী সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারের অভিযান শুরু হয়। ২৭ জুন 'লন্ডন টাইমস'-এ সংবাদ বের হয় যে, ২৬ জুনেই সারা দেশে গ্রেপ্তার হয়েছিল ৬৭৬ জন বিরোধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী।[১০৩] বিপন চন্দ্র তাঁর 'In the Name of Democracy : JP Movement and the Emergency' বইতে জানাচ্ছেন জরুরি অবস্থার সময় সারা দেশে প্রায় ১১০,০০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল।[১০৪] শীর্ষ নেতাদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, চরণ সিং, আশোক মেহেতা, অটল বিহারী বাজপাই, চন্দ্র শেখর, মোহন ধারিয়া, নানজী দেশমুখ, জর্জ ফার্নাডেজ প্রমুখ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে থেকেছেন কে আর ম্যালকানি

(১৯২১-২০০৩), কুলদীপ নাইয়ার, বীরেন্দ্র কাপুর, সুন্দর রাজন, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। তবে এই সময় সি. পি. আই. (এম.) বা ডি. এম. কে. দলের কোনও শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার হয়নি।[১০৫] এই সব গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মূলত 'মিসা' (Maintenance of Internal Security Act-MISA) ও ডি. আই. আর. (Defence of India Ruls) আইনের আওতায়। 'মিসা' আইন পাশ হয়েছিল ৭ মে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। যেখানে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দেহ জনক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।[১০৬] জরুরি অবস্থার সময় এই আইনের একাধিক সংশোধন করে আরও কঠোর করা হয়। যেখানে প্রথমে আটক করা ব্যক্তিকে ছয় মাসের বেশি বন্দি রাখা যেত না, সেখানে তা বাড়িয়ে দুই বছর পর্যন্ত করা হয়। তার উপর আটক হওয়া ব্যক্তির নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে কোর্টে আপিল করারও সুযোগ ছিল না।[১০৭]

জরুরি অবস্থায় সব থেকে বেশি কোপ পড়েছিল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর। কঠোরভাবে 'সেনসারশিপ' চাপানো হয় সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের উপর। ২৫ জুন রাত থেকে পরপর দুদিন দিল্লির বাহাদুর শা জাফর মার্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানেই দিল্লির বেশিরভাগ সংবাদপত্রের অফিসগুলি ছিল। যদিও 'হিন্দুস্তান টাইমস' ও 'স্টেটসম্যান'-এর অফিস সেখানে ছিল না। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর পদে থেকে ইন্দ্র কুমার গুজরালকে সরিয়ে বিদ্যাচরণ শুক্লাকে বসানো হয়। কারণ গুজরালের উপর অভিযোগ ছিল, তিনি শক্ত হাতে সংবাদমাধমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।[১০৮] ২৯ জুন নতুন মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা বিদেশী সাংবাদিকদের ডেকে বলেন, সেনসর না করিয়ে কোনো সংবাদ বিদেশে যাবে না; অন্যথায় সেই কাগজের প্রতিনিধিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।[১০৯] আর দিল্লির সম্পাদকদের হুঁশিয়ারি দেন, সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে কোনও প্রতিবাদ বরদাস্ত করা হবে না।[১১০] ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে 'Prohibition of Publication of Objectionable Matter Act' পাশ হয়। সরকারের প্রতি ঘৃণা, অবমাননা, অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনও 'শব্দ, চিহ্ন বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা'-এর প্রকাশকে এই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে; এমনকি সরকারের কোনও নীতি বা পদক্ষেপের সমালোচনাও এই আইনের বলে অসম্ভব হয়ে যায়।[১১১]

জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর থেকেই একাধিক বিদেশী পত্র-পত্রিকা ভারতে আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন 'দ্যা গার্ডিয়ান', 'সানডে টাইমস', 'লন্ডন টাইমস', 'লন্ডন ইকনমিস্ট', 'ডেলি টেলিগ্রাফ', 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস', 'নিউ স্টেটসম্যান' ইত্যাদি। আবার সাংবাদিকদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যেমন ওয়াশিংটন পোস্টের লিউইস সাইমনস, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের কেভিন রেফারটি, পিটার হাজেলহাস্ট প্রমুখ।[১১২]

সেনসরশিপের কারণে একাধিক সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, আবার অন্যান্য চাপের কারণে একাধিক সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দিতে প্রকাশক বাধ্য হয়। ইন্দিরা গান্ধির সবচেয়ে বড় পথের কাঁটা জনসংঘ ও আর. এস. এস. পরিচালিত 'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকা প্রথম থেকেই ইন্দিরা-বিরোধী লাইন অবলম্বন করেছে। এমনকি সঞ্জয় গান্ধির 'মারুতি প্রজেক্ট'-এর উপর একাধিক প্রশ্ন তুলেছিল। ফলে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার রাত্রেই এই পত্রিকার সম্পাদক কে আর ম্যালকানিকে গ্রেপ্তার করা হয়[১১৩] এবং পত্রিকার অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জর্জ ফার্নান্ডেজের সাপ্তাহিক 'প্রতিপক্ষ'-র অফিসে তালা ঝুলিয়ে সম্পাদক গিরিধারী রাঠিকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১১৪] সেনসরশিপের এরকম বাড়াবাড়ি অবস্থাতে বেশকিছু সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ মাথা নত করার থেকে নিজেদের পত্র বন্ধ রাখার পরিকল্পনা নেয়। এর মধ্যে ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের ইংরেজি ও হিন্দি সাপ্তাহিক 'এভরিম্যান' ও 'লোকনীতি', 'শঙ্কর'স উইকলি', 'সেমিনার', 'মেইনস্ট্রিম', 'হিম্মত, 'জনতা', 'পিপল'স ডেমোক্রাসি' ইত্যাদি।

সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আরও বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে আইন করে জুলাই ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রেস কাউন্সিল'-এর মতো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তুলে নেওয়া হয়। যেটি প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা, সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের মান বজায় রাখা এবং উন্নত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল।[১১৫] ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে স্বনিয়ন্ত্রিত 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া', 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া', 'সমাচার ভারতী' এবং 'হিন্দুস্থান সমাচার' এই চারটি সংস্থাকে একসঙ্গে মিশিয়ে একটি সংস্থা 'সমাচার'-এ রূপান্তরিত করা হয়। যাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হয়।[১১৬] এছাড়াও 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' ও টিভি চ্যানেল 'দূরদর্শন'-কে সরকার প্রথম থেকে নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করেছে।

কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রথম থেকেই সরকারের সঙ্গে আপসপন্থী থেকেছে। 'ইন্দুস্তান টাইমস', 'দ্যা হিন্দু', এবং 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' তাদের মধ্যে অন্যতম। জওহরলাল নেহেরুর প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' এই সময় তার বিখ্যাত উদ্ধৃতি 'Freedom is in peril, defend it with all your mind' মুছে দিয়ে জরুরি অবস্থার সমর্থন করে গেছে।[১১৭] এত কিছুর পরেও 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'স্টেটসম্যান' আপসে না গিয়ে নিজেদের জায়গায় স্থির থেকে সংবাদ পরিবেশন করে গেছে। এরা সেনসর হওয়া প্রতিবেদনগুলির জায়গা অন্যান্য কিছু দিয়ে না ভরিয়ে সেগুলিকে ফাঁকা রাখে।[১১৮]

দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা জেলবন্দি এবং সংবাদমাধ্যমের উপর সেনসরশিপের দাপট ইন্দিরা গান্ধিকে স্বস্তি দিল। দেশে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ সংগঠিত হওয়ার তেমন কোনও উপায় থাকল না। এই অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর সরকার নিজের জামানা প্রলম্বিত করার পথে হাঁটলেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকেই তিনি একের পর এক আইন পাশ এবং একাধিকবার সংবিধান সংশোধন করলেন। 'মিসা' আইনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সংবিধানের ১৪, ২১ ও ২২ নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য নাগরিকের আদালতে যাওয়ার অধিকার ২৭ জুন ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশে বাতিল করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সুপ্রিমকোর্ট 'habeas corpus' অর্থাৎ আটক হওয়া ব্যক্তির আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার বাতিল করে দেয়।[১১৯] যেটি গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জুলাই ১৯৭৫, সংবিধানের ৩৮ তম সংশোধনে বলা হয়, জরুরি অবস্থা জারি নিয়ে কোর্টে 'চ্যালেঞ্জ' করা যাবে না। আগস্ট ১৯৭৫, সংবিধানের ৩৯ তম সংশোধনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আদালতে দায়ের করা যাবে না, যাবে কেবল মাত্র সংসদ নিয়োজিত একটি সংস্থার কাছে। ৪১ তম সংশোধনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপালকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, ক্ষমতায় থাকা কালীন তাঁদের উপর কোনো ফৌজদারী মামলা করা যাবে না।[১২০] নভেম্বর ১৯৭৬, সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন হয়ে যায়। এটি জরুরি অবস্থার সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন। এখানে সংসদের ক্ষমতাকে প্রবলভাবে বাড়িয়ে তোলা হল। সংসদ চাইলে সংবিধানের যা খুশি পরিবর্তন করতে পারে।[১২১]

শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ জরুরি অবস্থার রীতিমতো বিরোধিতা করলেও প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবেই থেকেছে; বলতে গেলে এক রকম সমর্থনই করেছিল। এর পিছনে অবশ্য কিছু কারণ ছিল। দেশে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলেও পাশাপাশি দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উপর, সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী এবং অতি-বামপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর। জরুরি অবস্থার আগে এঁদের খুব কম জনসমর্থনই ছিল; এমনকি এরা দেশের গণতন্ত্রেও তেমন কোনও বিশ্বাস রাখত না। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরেই সারা দেশে ২৬টি সাম্প্রদায়িক ও অতি-বামপন্থী সংগঠনকে বাতিল করে দেওয়া হয়।[১২২] যেমন আর. এস. এস., আনন্দমার্গ, জামাত-ই-ইসলাম, নকশাল ইত্যাদি। জরুরি অবস্থার পূর্বে দেশব্যাপী আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি দেখা দিয়েছিল তা অনেকটা উন্নতি লাভ করেছিল। শহরের মধ্যে অপরাধ, 'হুলিগানিজম' মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল তা কমানো গেল।[১২৩] হরতাল, বন্ধ, ঘেরাও, ধর্মঘট যেভাবে শিল্পাঞ্চলগুলিকে ধ্বংসের মুখে ফেলেছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। প্রশাসনেও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। ২৬ জুনের পর সরকারি কর্মচারীদের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়—১. যথা সময়ে অফিসে আসতে হবে, ২. টিফিনে গল্পগুজব করে বাইরে সময় কাটানো চলবে না, ৩. নির্দিষ্ট সময়ের আগে কেউ অফিস ছেড়ে যেতে পারবে না, ৪. এই তিনটি পূর্বকথিত নিয়ম অমান্য করলে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[১২৪] ফলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হয়। ট্রেন, এরোপ্লেন সময়মত চলত; যাত্রিরা কর্মচারীদের কাছে সভ্য ব্যবহার পেত। বহু অসাধু সরকারি কর্মচারীকে ছেঁটে ফেলা হল। 'মিসা' আইন প্রয়োগ করে হাজার হাজার চোরাচালানকারী, কালোবাজারির, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও দেশের অর্থনীতিতেও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৭৫-এ ভালো বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেশ কমে।[১২৫] যা সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেয়। তবে ১ জুলাই ১৯৭৫, ইন্দিরা গান্ধির 'বিশ দফা' কর্মসূচির ঘোষণা সাধারণ মানুষের মনে অনেক বেশিই আশা জোগায়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি ছিল এর মর্মবস্তু এবং আসাধু ব্যবসায়ী, চোরাচালানকারী, কর ফাঁকি দেওয়া, 'বন্ডেড শ্রমিক' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেখানে।[১২৬]

জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধির দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জয় গান্ধির উত্থান ঘটে জোরালভাবে। তিনিই ছিলেন জরুরি অবস্থার সব থেকে বড়ো প্রচারক। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি জনগণের কাছে খুব বেশি করেই দৃশ্যমান হতে থাকেন। কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে, তিনিই প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তরসুরি।

পার্টি বা সরকারের কোনও পদে সঞ্জয় গান্ধি আসীন ছিলেন না, তাসত্ত্বেও তিনি সরকারি ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতেন, মন্ত্রীসভা ও সরকারের সমস্ত নথিপত্র দেখতেন, এমনকি মায়ের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তও নিতেন। মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর পদে ইন্দ্র কুমার গুজরালের পরিবর্তে বিদ্যাচরণ শুক্লাকে বসানো বা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে স্মরণ সিং-এর বদলে বংশীলালকে নিয়োগ করা সব ক্ষেত্রেই সঞ্জয় গান্ধির হস্তক্ষেপ ছিল।[১২৭] সঞ্জয় গান্ধির প্রতি রেডিও, টেলিভিশন, ফ্লিমস ডিভিশন, সংবাদপত্র অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে শুরু করে। সেইসব প্রচারে তাঁকে যেন 'কাল্ট পার্সোনালিটি' হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চলতে থাকে। খুশবন্ত সিং তাঁর 'ইলাসট্রেটেড উইকলি' পত্রিকায় স্তুতিগান গাইলেন, এক বছরে আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে সঞ্জয় গান্ধিকে নিয়ে ১৯২টি সংবাদ-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, দূরদর্শন তাঁর কর্মকাণ্ডকে ঘিরে ২৬৫ টি অনুষ্ঠান করে, অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার সফরকে ঘিরে ফ্লিমস ডিভিশন 'একটি স্মরণীয় দিন' নামে এক পূর্ণ দৈর্ঘ্যর তথ্যচিত্র প্রকাশ করে।[১২৮] ফলে খুব দ্রুতই দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঞ্জয় গান্ধি সমীহর পাত্র হয়ে উঠেন।

সঞ্জয় গান্ধি ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে পাঁচ দফা কর্মসূচি নিয়ে আসেন। সেগুলি ছিল—১. পণ-প্রথার বিলোপ সাধন, ২. পরিবার পরিকল্পনা, ৩. বনসৃজন, ৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং ৫. জাতিগত বৈষম্যের অবসান ঘটানো। এই কর্মসূচিগুলি ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। সেজন্যই পাঁচ-দফা কর্মসূচি বিশ দফা কর্মসূচির থেকে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা খুব দ্রুতই বিতর্কের সৃষ্টি করে। এটা ঠিক যে ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাধা স্বরূপ, তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় তা নির্দয়তা ও অমানবিকতার পরিচয় বহন করে। দেশ জুড়ে জোরপূর্বক নির্বীজকরণ করার প্রক্রিয়া

চলে। ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে ২৬.৬৯ লক্ষ এবং ১৯৭৬-১৯৭৭ সালে ৮২.৬১ লক্ষ নির্বীজকরণ হয়।[১২৯] এই কাজে সরকারি কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, এমনকি সরকারি ঠিকাদারদেরও নিযুক্ত করে তাদের উপর নির্দিষ্ট পরিমানের লক্ষ্যমাত্রা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তা পূরণে ব্যর্থ হলে তাদের ভাগ্যে জুটত তিরস্কার, পদোন্নতিতে বাধা, মাইনে আটকে দেওয়া হত, এমনকি চাকরিও হারাত; অন্যদিকে যারা পূরণ করতে পারত তাদের পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নতি, মাইনে বৃদ্ধি করা হত এবং অন্যান্য অফিসিয়াল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত।[১৩০]

সরকারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, যারা নির্বীজকরণের যোগ্য, তাদেরকে বিভিন্ন হুমকির মুখে পড়তে হত (যেমন চাকরি হারানো) যদি না নিজের অথবা নিজের স্ত্রীর নির্বীজকরণের সংশাপত্র কর্মস্থলে দেখাতে পারত।[১৩১] এই নিয়ম চাকুরিজীবীদের বাইরে অন্যান্য জনগণের উপরেও লাগু ছিল। শংসাপত্র দেখাতে না পারলে সরকারি স্কুলে তৃতীয় বা চতুর্থ সন্তানকে ভর্তি নিত না। সরকারের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যেমন বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষিজমি ও কৃষিঋণ, সরকারি চাকরি ইত্যাদি নির্ভর করত এই সংশাপত্রের উপর। দিল্লির সরকারি হাসপাতালে যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন শংসাপত্র দেখানো হত যাতে প্রমাণিত হয় যে সেই পরিবারে দুটির বেশি সন্তান নেই ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা দেওয়া হত না।[১৩২]

নির্বীজকরণের ভয়ঙ্কর প্রকোপ শহরে ও গ্রামে উভয় ক্ষেত্রেই পড়েছিল। পুলিশকে এ কাজে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। গৃহহীন, ভবঘুরেদের এমনকি সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ঘর থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হত 'ভেসকটমি ক্যাম্প'-এ; প্রায়ই দেখা হত না তাদের বয়স কিংবা তারা বিবাহিত কিনা। উত্তর ভারতে এই প্রকোপ ছিল সব থেকে বেশি, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ছিল অন্যতম। 'ভেসকটমি ক্যাম্প'-গুলি সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধান মেনে তৈরি হয়নি। কখনও তাঁবু খাটিয়ে বা স্কুলে এই ক্যাম্পগুলি গড়ে উঠত। যেখানে যথাযথ উপকরণও থাকত না। ফলে এই নির্বীজকরণ করতে গিয়ে সংক্রমণের শিকার হতে হত, এমনকি বহু মানুষ মারাও যায়।[১৩৩]

ঘটনাচক্রে পরিবার পরিকল্পনার শিকার হয়ে গেলেন গায়ক কিশোর কুমার। অনেক চিত্রতারকা, গায়ক ও বাদ্যকর নির্বীজকরণের জন্য টাকা তোলার এক অনুষ্ঠানে ভাগ নিতে

রাজি হলেও কিশোরকুমার তাতে গররাজি ছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কোপ পড়ল তাঁর উপর। আকাশবাণীতে তাঁর গান নিষিদ্ধ হয়ে গেল, যেসব সিনেমায় তাঁর অভিনয় বা গান আছে সেসব সিনেমা প্রদর্শনে বাধা আসে ইত্যাদি।[১৩৪]

পরিবার পরিকল্পনার পাশাপাশি আর একটি ঘটনা নগর সৌন্দর্যায়নের নামে বস্তি এলাকার উচ্ছেদ ও ধ্বংস প্রবল বিতর্ক তৈরি করে। এর সব থেকে বেশি প্রভাব দেশের রাজধানী দিল্লিতেই পড়েছিল। সঞ্জয় গান্ধির এই চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথারিটির উপ-সভাপতি জগমোহনের সঙ্গে। তিনিও চাইতেন দিল্লির বস্তি এলাকা বা 'ঝোপরপট্টি'-গুলিকে উচ্ছেদ করে শহরের অন্য কোনও জায়গায় বসিয়ে দিতে। সঞ্জয় গান্ধির একই রকম চিন্তা তাঁকে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানোর সুযোগ এনে দেয়।

জরুরি অবস্থার শুরু থেকে ১৯৭৬ সালের শেষপর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার বস্তি বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ধ্বংস করে এবং সেখানকার প্রায় সাত লক্ষ বাসিন্দাকে শহরের উপকণ্ঠে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।[১৩৫] পুনর্বাসনের যেসব কলোনিগুলিতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি তৈরি হয়নি, তার উপর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, অন্যান্য সুবিধা তেমন ছিল না, এমনকি পরিশুদ্ধ পানীয় জলেরও অভাব ছিল। সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কলোনিগুলিকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, যেমন স্কুল, হাসপাতাল, ক্রীড়া উদ্যান, পানীয় জল ইত্যাদি। কিন্তু তা কেবল খাতায় কলমে ছিল, বাস্তবে নয়। তার উপর এই কলোনিগুলি শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বস্তি অঞ্চলগুলিতে থাকত অর্থ উপার্জনের জন্য শহরের বাইরে থেকে কাজে আসা প্রান্তিক জনগণ। যেমন দিনমজুর, রিক্সা বা ভ্যান চালক, কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি। সেজন্য তারা সাধারণত নিজেদের কর্মস্থলের কাছাকাছিই নিজেদের মাথা গোঁজার মতো জায়গা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু যখন তাদের সেখান থেকে উৎখাত করে দূরের কলোনিতে পুনর্বাসন দেওয়া হল তখন আঘাত পড়ল তাদের রোজকার কর্ম জীবনের উপর।

জরুরি অবস্থার অবসান ও ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় :

জরুরি অবস্থা যেমন হঠাৎ করেই জারি হয়েছিল এবং আকাশবাণীতে সেই সংবাদ ইন্দিরা গান্ধি এক বক্তব্যে দেশবাসীর কাছে রেখে ছিলেন, সে রকমই ১৯৭৭ সালের ১৮ জানুয়ারি আর একবার হঠাৎ করেই প্রধানমন্ত্রী আকাশবাণীতেই ঘোষণা করেন আগামী মার্চ মাসে নতুন করে লোকসভার নির্বাচন হবে।[১৩৬] এই ঘোষণার পরপরই যাদের কারাবন্দি করা হয়েছিল তাদেরও মুক্ত করা শুরু হয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধির এরকম আকস্মিক মানসিক পরিবর্তনের কারণ কী—তা বলা দুরহ। হয়ত জরুরি অবস্থার স্বৈর-শাসন নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। বৈদেশিক মহলেও জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্রের অপহরণ এবং স্বৈরশাসন নিয়ে প্রবল সমালোচনা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে। সঞ্জয় গান্ধির উচ্ছৃঙ্খল পদক্ষেপে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন; অথবা তিনি হয়ত আশ্বস্ত ছিলেন যে, নির্বাচন হলে তিনিই জয়ী হবেন। এ নিয়ে কোনও কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

যাই হোক বন্দি নেতারা মুক্ত হলে মার্চের নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলতে শুরু করে। ১৯ জানুয়ারি মোরারজি দেশাই-এর বাড়িতে জনসঙ্ঘ, ভারতীয় লোকদল, কংগ্রেস (ও)-এর বৈঠক হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় সকলে মিলে অভিন্ন প্রতীকে একজোটে লড়াই করবে। সেই সূত্র ধরেই ২৩ জানুয়ারি গঠিত হয় 'জনতা দল'। এর দশদিন পরেই ইন্দিরা কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা থেকে জগজীবন রাম ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেস ফর ডেমক্রেসি (সি. এফ. ডি.) নামে একটি ভিন্ন দল গঠন করেন। তবে এই দল জনতা দলের সঙ্গে জোট করেই লড়াই করে। কারও বুঝতে বাকি থাকল না গতি কোন দিকে। জরুরি অবস্থার স্বৈর শাসন নিয়ে জনগণের মধ্যেও চরম ক্ষোভ সেই সময় কাজ করছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতেও বিরোধীপক্ষ ছাড়ল না। তাদের প্রচারে উঠে এল গণতন্ত্রের কথা, নির্বীর্যকরণের আতঙ্কের দিনগুলির অভিজ্ঞতা। ফলে ইন্দিরা গান্ধি প্রথম থেকেই অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন। বাস্তবেও ঘটল তাই। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে (যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ) কংগ্রেস খুব বিশ্রীভাবে হারল, কারণ জরুরি অবস্থার কোপ সব থেকে বেশি সেই সব রাজ্যগুলিতেই পড়েছিল। শেষপর্যন্ত ভোটের ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় কংগ্রেস পায় মাত্র ১৫৩টি আসন, সেখানে জনতা দল ও সি. এফ. ডি. মিলে ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে। এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই।[১৩৭]

তথ্যসূত্র :

১. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, রচনা সংগ্রহ, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২, পৃ-৫০৯

২. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, আশীষ লাহিড়ী (অনু.), আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ-২৬৬

৩. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১৪

৪. Election Commission of India, Statistical Report on General Elections, 1962 to the Third Lok Sabha, Volume I, New Delhi, Page-56

https://web.archive.org/web/20140718185518/http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1962/Vol_I_LS_62.pdf

৫. Election Commission of India, Statistical Report on General Elections, 1967 to the Fourth Lok Sabha, Volume I, New Delhi, Page-75

https://web.archive.org/web/20140718185108/http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1967/Vol_I_LS_67.pdf

৬. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭১

৭. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১৬

৮. তদেব, পৃ-৫১৭

৯. তদেব, পৃ-৫১৭

১০. তদেব, পৃ-৫১৮

১১. তদেব, পৃ-৫১৮

১২. তদেব, পৃ-৫১৯

১৩. তদেব, পৃ-৫১৯

১৪. তদেব, পৃ-৫১৯

১৫. তদেব, পৃ-৫২১

১৬. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৮

১৭. তদেব, পৃ-২৮৯

১৮. তদেব, পৃ-২৮৯

১৯. আচার্য, অনিল (সম্পা.); *সত্তর দশক, প্রথম খণ্ড,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, জুন ২০১৪, পৃ-১১৮

২০. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫২৩

২১. তদেব, পৃ-৫২৪

২২. আচার্য, অনিল (সম্পা.); *সত্তর দশক,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮

২৩. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫২৪-৫২৫

২৪. আচার্য, অনিল (সম্পা.); *সত্তর দশক,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮

২৫. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* আশীষ লাহিড়ী (অনু.), আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৩৯৪

২৬. তদেব, পৃ-৩৯৪

২৭. তদেব, পৃ-৩৯৫

২৮. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮১

২৯. আচার্য, অনিল (সম্পা.); *সত্তর দশক, প্রথম খণ্ড,* প্রাগুক্ত, পৃ-১২০

৩০. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮১

৩১. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৫

৩২. ক. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮১

খ. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৫

৩৩. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮২

৩৪. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৮

৩৫. ক. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৩

খ. আচার্য, অনিল (সম্পা.); *সত্তর দশক, প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ-১২১

৩৬. ক. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৪

খ. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০২

৩৭. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, Penguin Books, India, 2003, Page-14

৩৮. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৪

৩৯. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩৯

৪০. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ*, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ-১৬

৪১. https://en.wikipedia.org/wiki/1970_Pakistani_general_election

০২/০২/২০২৩

৪২. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (অনু.), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ-৩৪

৪৩. তদেব, পৃ-৩৪

৪৪. তদেব, পৃ-৩৫

৪৫. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯

৪৬. তদেব, পৃ-৪০

৪৭. তদেব, পৃ-৪১

৪৮. তদেব, পৃ-৪১

৪৯. ঘোষ, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক,* তৃতীয় পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২, পৃ-২২০

৫০. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৬

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৮৮

গ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ-৩৪

৫১. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৬

খ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭-৩৮

৫২. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৭

খ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮

গ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১০৪

৫৩. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৮

খ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭

গ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১১০

৫৪. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১১১-১১২

৫৫. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

৫৬. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮

৫৭. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯

৫৮. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

৫৯. হাসান, শফিকুল; *মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা,* রঞ্জন প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৭৮, পৃ-৬-৭

৬০. তদেব, পৃ-৮

৬১. তদেব, পৃ-৮-৯

৬২. তদেব, পৃ-১৩

৬৩. তদেব, পৃ-১৪

৬৪. তদেব, পৃ-১৫

৬৫. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭

৬৬. তদেব, পৃ-৩৮

৬৭. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৬

৬৮. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৭

৬৯. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী,* প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪২

৭০. দাশগুপ্ত, অভিজিৎ; *বিস্থাপন ও নির্বাসন : ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* আশীষ লাহিড়ী (অনু.), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ-১৭২

৭১. তদেব, পৃ-১৮৮

৭২. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪১১

৭৩. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-15

৭৪. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯১

৭৫. তদেব, পৃ-২৯১

৭৬. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-16-18

৭৭. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫১

৭৮. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-22

৭৯. তদেব, পৃ-23

৮০. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৬

৮১. সেন, সুকোমল; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-২০১০*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ-৪৪০

৮২. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-36

৮৩. তদেব, পৃ-36-37

৮৪. তদেব, পৃ-37

৮৫. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৯

৮৬. তদেব, পৃ-৪৩০

৮৭. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫৭

৮৮. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩১

৮৯. সেন, সুকোমল; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-২০১০*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩০

৯০. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩৬

৯১. তদেব, পৃ-৪৩৬

৯২. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৩

৯৩. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-62

৯৪. তদেব, পৃ-64

৯৫. তদেব, পৃ-65

৯৬. তদেব, পৃ-69

৯৭. তদেব, পৃ-66

৯৮. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, Penguin Books, India, 2016, Page-15

৯৯. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-69

১০০. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-23

১০১. Gandhi, Indira; Proclamation of Emergency, Rudrangshu Mukherjee (edited), Great Speeches of Modern India, Random House, India, 2007, Page-310

১০২. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪৪

১০৩. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ; *কয়েকটি তথ্য*, জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পা.), কলকাতা পত্রিকা, বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা-বর্ষা ১৯৭৫ ও বসন্ত ১৯৭৭, প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃ-১০

১০৪. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-157

১০৫. তদেব, পৃ-157

১০৬. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪৩

১০৭. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-162

১০৮. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-50

১০৯. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ; *কয়েকটি তথ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১

১১০. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-52

১১১. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-158

১১২. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ; *কয়েকটি তথ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১-১২

১১৩. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-30

১১৪. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ; *কয়েকটি তথ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

১১৫. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-158

১১৬. তদেব, পৃ-১৫৯

১১৭. তদেব, পৃ-১৫৮

১১৮. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-54

১১৯. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-162

১২০. তদেব, পৃ-১৬৩

১২১. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪৯

১২২. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-172

১২৩. তদেব, পৃ-173

১২৪. তদেব, পৃ-174

১২৫. তদেব, পৃ-174

১২৬. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭৩

১২৭. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫৮

১২৮. তদেব, পৃ-৪৫৯

১২৯. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-206

১৩০. তদেব, পৃ-204

১৩১. তদেব, পৃ-204

১৩২. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, প্রাগুক্ত, Page-237-238

১৩৩. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-205

১৩৪. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৫

১৩৫. Chandra, Bipan; *In the Name of Democracy: JP Movement and the Emergency*, প্রাগুক্ত, Page-208

১৩৬. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৮

১৩৭. তদেব, পৃ-৪৭০-৪৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাতের দশকের জটিলতার সূত্রপাত হয় ছয়ের দশকে। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও মানসিক দ্বন্দ্বে ফেলেছিল। কংগ্রেস সরকারের একের পর এক ব্যর্থতা যেমন সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও ভাঙন বিকল্প চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। যার প্রভাব পড়ে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬৭)। যেখানে কংগ্রেস যেমন একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না, তেমনি বাম শিবির থেকেও এল না একক পার্টির সরকার গড়ার সুযোগ। ফলে তৈরি হল বিভিন্ন পার্টির সমন্বয়ে একটি সরকার। যে সরকারের নাম যুক্তফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম ক্ষমতায় এল অকংগ্রেসি সরকার।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার :

১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উদ্দেশ্যই ছিল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা। সেজন্য রাজ্যের অকংগ্রেসি পার্টিগুলির জোটবাঁধা ছিল একান্ত জরুরি। কিন্তু দুই কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই এবং সি পি এম) মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে মতভেদ তৈরি হয় তাতে জোট বন্ধনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফলে নির্বাচনের লড়াই হয় ত্রিমুখী। একদিকে থাকে কংগ্রেস, অপরদিকে থাকে দুটি জোট— সি পি আই (এম), আর এস পি, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি আই, এস এস পি, এস ইউ সি, ওয়ার্কার্স পার্টির সমন্বয়ে একটি জোট ইউ. এল. এফ. (ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট) এবং বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লকের সমন্বয়ে আর একটি জোট পি. ইউ. এল. এফ. (পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট)।[১] ২২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ১২৭টি আসন; অপর দুটি ফ্রন্টের মধ্যে সি পি আই (এম)-৪৩, আর এস পি-৭, এস ইউ সি-৪, ওয়ার্কর্স পার্টি-২, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক-১৩, বাংলা কংগ্রেস-৩৪, সি পি আই-১৬, ফরওয়ার্ড ব্লক-

১৩, পি এস পি-৭, এস এস পি-৭ ইত্যাদি।[২] এই নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছু প্রভাবশালী নেতা পরাজিত হন। যেমন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জীর কাছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় অখ্যাত জে. এম. বিশ্বাসের কাছে অতুল্য ঘোষ পরাজিত হন।[৩] নির্বাচনের ত্রিশঙ্কু ফলকে মাথায় রেখে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি জোট বেঁধে অকংগ্রেসি সরকার গঠন করে। তৈরি হয় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। যার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী সি পি আই (এম)-এর জ্যোতি বসু হন।

নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই ১ মার্চ ১৯৬৭ কলকাতার ময়দানে এক জনসভায় ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে যুক্তফ্রন্ট সরকার।[৪] যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সমস্যা মেটানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, ট্রেড ইউনিয়নের গঠন করার অধিকারের স্বীকৃতি, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার, জনগণের আন্দোলন দমন না করার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই অত্যধিক প্রতিশ্রুতি জনগণের মনে অধিক আশার সঞ্চার করে। কিন্তু সরকারের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে তিনটি সমস্যা—১. খাদ্য-সংকট জনিত সমস্যা, ২. শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের সমস্যা, ৩. জমিকে কেন্দ্র করে সমস্যা। সারা দেশ জুড়েই এসময় অর্থনৈতিক মন্দা ও খাদ্য-সংকট চলছিল। ফলে কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ যে পূর্বের মত সাহায্য পাবে না সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সি. পি. আই. (এম) অভিযোগ আনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অসম আচরণ করছে। জ্যোতি বসু এবিষয়ে লিখেছেন—

> ‘কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বণ্টনে, দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য দানে এবং খাদ্য-ঘাটতি পূরণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গুরুতর অবিচারের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। কোন কোন জেলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এবং আগের বছরের তুলনায় খাদ্য-ঘাটতি বেশি হওয়া সত্ত্বেও আগের বছরে পশ্চিমবঙ্গকে যে পরিমাণ চাল-গম দেওয়া হয়েছিল এবার কেন্দ্রীয় সরকার সেটুকুও দিতে অস্বীকার করে।...ফলে রাজ্যের রেশনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।’[৫]

বাসব দাশগুপ্তর মতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি যে জনসমর্থন ছিল সেই জনগণকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চালাতে কেন্দ্র সরকার ইচ্ছা করেই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ পূর্বের

তুলনায় কম করে দেয়। যেমন মে মাসে প্রাপ্য গমের তুলনায় ৪৩ হাজার টন কম গম দেয়, ১৯৬৬ সালে যেখানে ২৮ হাজার টন চিনি দিয়েছিল সেখানে ১৯৬৭-তে মাত্র ১৭ হাজার টন দেয়, জুনে ১৫ হাজার টনের জায়গায় মাত্র চার হাজার টন চাল দেয়।[৬] যখন খাদ্য-সংকট চরমে তখন কিছু দলের নেতারা সব দোষ খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের উপর চাপান। এমনকি তারা এও বলতে ছাড়লেন না যে চোরা কারবারিদের ড. ঘোষ ধরছেন না।[৭]

দ্বিতীয় সমস্যা এল শিল্পাঞ্চল থেকে। গোটা ভারতেই তখন প্রচণ্ড শিল্প-মন্দা চলছিল। ফলে শিল্পকে বাঁচানোর কারণ দেখিয়ে শিল্পপতিরা ছাঁটাই শুরু করে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে।[৮] সারা ভারতের শিল্পাঞ্চলের এই এক রূপ। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। শুরু হয় আন্দোলন, ঘেরাও। সারা দেশে ১৯৬৭ সালে ২,৮১৫ শ্রমবিরোধে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে মোট ১৭.২ মিলিয়ন শ্রমদিবস নষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশি—৫.৯ মিলিয়ন শ্রমদিবস নষ্ট হয়।[৯] কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের আন্দোলনে পুলিশ না পাঠানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় এই সমস্যার সহজে সমাধান হয় না। ফলে কলকারখানা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় থাকল না।

তৃতীয় সমস্যা চাষের জমিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ কৃষক ও ভাগচাষিরা জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। মালদাহ, দুই চব্বিশ পরগনা জেলায় আন্দোলনের তীব্রতা সবথেকে বেশি ছিল।[১০] যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার কিছুদিন পরেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙ জেলার নকশালবাড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে জমিদখলকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং অতি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের সঙ্গে ছাত্র, যুব ও শ্রমিকরাও যোগ দেয়। যা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার পূর্বে নকশাল রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময়েই তার উন্মেষ ঘটে।

নকশালবাড়ির ঘটনা ও নকশাল আন্দোলনের উন্মেষ :

'নকশাল' কথাটির উদ্ভব দার্জিলিঙ জেলার একটি অঞ্চল নকশালবাড়ির নাম থেকে। কিন্তু বর্তমানে 'নকশাল' শব্দবন্ধটা আর কেবলমাত্র কোনও অঞ্চলের নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—তা একটি রাজনৈতিক লাইনের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জমিকে কেন্দ্র করে কৃষক ও জোতদার-জমিদারের মধ্যে লড়াই নতুন কিছু নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে জমিদারী শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বারবার সংগঠিত হয়েছে কৃষক আন্দোলন। তেভাগা, তেলাঙ্গানা আন্দোলনের মতোই নকশালবাড়ি আন্দোলনও প্রথম দিকে একটি কৃষক আন্দোলনই ছিল।

নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল কমিউনিস্ট পার্টির দুই আদর্শগত লাইনের দ্বন্দ্ব থেকে। একদিকে ছিল নির্বাচনমুখী, সংসদসর্বস্ব রাজনীতি; অন্যদিকে সংগ্রামমুখী বিপ্লবকামী রাজনীতি। প্রথম গোষ্ঠী 'দক্ষিণপন্থী' মনস্ক—তারা সোভিয়েত-পন্থী এবং ক্রুশ্চেভের শোধনবাদে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় গোষ্ঠী 'বামপন্থী' মনস্ক—তারা শোধনবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানরত। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিল পার্টির কর্মী-শ্রেণি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই রাজনৈতিক লাইনগত সংগ্রাম আগে থেকেই ছিল। চিন-ভারতের যুদ্ধে (১৯৬২) এই বিভাজনকে আরও প্রকট করে। একটি গোষ্ঠী এই যুদ্ধের জন্য চিনের দিকে আঙুল তুলল তো আর একটি গোষ্ঠী ভারতকেই দায়ী করল। ফলে যারা চিনের পক্ষাবলম্বন করেছিল তাদের 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে জেলবন্দি করা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন—চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, সৌরেন বোস, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রমুখ। এঁরাই পরবর্তী সময়ে নকশাল আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি এই মতাদর্শগত বিরোধে শেষপর্যন্ত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় (১৯৬৪)। বিপ্লবকামী সদস্যরা সি. পি. আই. থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন সি. পি. আই. (এম)। কিন্তু শেষপর্যন্ত সি. পি. আই. (এম)-ও নিজেকে নির্বাচনমুখী সংসদীয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পারল না। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তারা ভাগ নেয় এবং রাজ্যে সরকার গঠন করে—একক সরকার নয়, যুক্তফ্রন্ট সরকার। যেখানে জোট বেঁধেছিল যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই সি. পি. আই.-এর সঙ্গে, মূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে—যার রাজনৈতিক লাইন

কংগ্রেস-বহির্ভূত নয়। ফলে আবার নতুন করে তৈরি হয় পার্টির মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব। পার্টির ভিতরে থাকা বিপ্লবী ভাবধারার কর্মীদের মনে পুনরায় জন্ম নেয় ক্ষোভ ও প্রশ্ন। বিশেষ করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

কিন্তু প্রথমদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন সাধারণ মানুষের মনে এক শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার আশা জুগিয়েছিল। তার ১৮ দফা কর্মসূচির ৩ নং কর্মসূচিতে বলে—

> ‘সরকার প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, উপযুক্ত সেচ ও জল নিষ্কাশন, সার, উন্নত বীজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত গবাদি পশু ও কৃষি ঋণ সরবরাহ করার মাধ্যমে কৃষকদের প্রাপ্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা করবে এবং ফসলের যুক্তিসংগত দামের ব্যবস্থা করবে। দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষি, খেত-মজুর এবং দুর্দশাগ্রস্ত সকল শ্রেণির কৃষকেরা যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন সেই সব দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।’[১১]

এবং ১৪ নং কর্মসূচিতে বলে—

> ‘যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক এবং সর্বশ্রেণির কর্মচারীদের নিজেদের ন্যায্য দাবি ও অভাব-অভিযোগ পেশ করার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্দোলন দমন করবে না। জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে যুক্তফ্রন্ট শাসনকার্য-পরিচালন ব্যবস্থা ও পুলিশবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করবে।’[১২]

এই সময় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা একটি সার্কুলারে বেনামি ও বে-আইনিভাবে লুকানো জমির উদ্ধার ও বণ্টন করা, উচ্ছেদ বন্ধ করা, প্রগতিশীল ভূমি-সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার এবং কৃষকদের বিভিন্ন দাবিগুলি নিয়ে বিভিন্ন কৃষক সমিতি নিজ দায়িত্বে সুসংবদ্ধ আন্দোলন করবে এরকম আশ্বাস দেয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কৃষক সমিতি যখন সত্যিই আন্দোলন শুরু করল তখন প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব সেটা ভালো চোখে নেয়নি।[১৩] কৃষক নেতা তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারও বারবার বলছিলেন অতিদ্রুত জমি-বণ্টন করার কথা। কিন্তু আইনি জটিলতা সে কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে কথাও স্বীকার করেন।[১৪] ফলে সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের

ভরসা সংকুচিত হতে থাকে। সি. পি. আই. (এম) পার্টির ভিতরে বিক্ষুব্ধ ক্যাডাররা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

এর আগে থেকেই দক্ষিণবঙ্গে যখন সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, অসিত সেন, পরিমল দাসগুপ্ত, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুনীতি কুমার ঘোষ প্রমুখেরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে একটি বিতর্কমূলক আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছেন তখন উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বোস, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ বিপ্লবের প্রয়োগভিত্তিক সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রাম করছেন।[১৫] চারু মজুমদার ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু করে ৩ এপ্রিল ১৯৬৭ সালের মধ্যে তাঁর আটটি দলিল রচনাও সমাপ্ত করেছেন। দলিলগুলি হল—

১. 'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য' (২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৫)

২. 'শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করুন'

৩. 'ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসের উৎস কী?' (৯ এপ্রিল, ১৯৬৫)

৪. 'আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান'

৫. '১৯৬৫ সাল কি সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে?'

৬. 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই এখনকার প্রধান কাজ' (৩০ আগস্ট, ১৯৬৬)

৭. 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলুন'

৮. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে' (৩ এপ্রিল, ১৯৬৭)

নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এই দলিলগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দলিলেই তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন—

> 'ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হবে—কৃষি বিপ্লব সফল কর। কৃষি বিপ্লবের কার্যক্রমকে আমরা যতখানি শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে

> প্রচার করতে ও তাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারবো, ততখানি তারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। কৃষকের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী প্রচার প্রতিটি সক্রিয় দলের আলোচ্য বিষয় হওয়া চাই।'[১৬]

দ্বিতীয় দলিলে বলা হয়, এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের কথা। শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু দাবি-দাওয়া আদায় করাই প্রকৃত বিপ্লব নয়, সর্বহারাশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই একমাত্র লক্ষ্য।[১৭] ভারতের কৃষকদের ধনী, মধ্য, দরিদ্র ও ভূমিহীন এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে চতুর্থ দলিলে। এখানে যে কোনও গণ-আন্দোলনে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করার নির্দেশ আছে। মাও সে তুং-এর 'Tit for Tat struggle'-এর প্রসঙ্গ তুলে সক্রিয় কর্মীদলের সাহায্যে প্রত্যেকটি আক্রমণের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করার কথা বলেছেন।[১৮] পঞ্চম দলিলে সি. পি. আই. (এম)-এর শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের কর্মসূচিকে শোধনবাদী বলে আক্রমণ করেছেন এবং গণ-আন্দোলনের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণি, সংগ্রামী কৃষকশ্রেণি ও সংগ্রামী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান সশস্ত্র হতে, সশস্ত্র ইউনিট তৈরি করতে এবং প্রত্যেকটি সশস্ত্র ইউনিটকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে।[১৯] ষষ্ঠ দলিলে সি. পি. আই. (এম) নেতৃবৃন্দকে বুর্জোয়াশ্রেণির 'লেজুর' বলে আক্রমণ করেন এবং মাও সে তুং-এর 'আঘাত হানার জন্য আঘাত হানা নয়, খতম করার জন্যই আঘাত হানা' বাক্য উল্লেখ করে আঘাতের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন পুলিশ, মিলিটারি ও আমলাতন্ত্রদের এবং সেসঙ্গে শ্রেণিশত্রুদের অস্ত্র সংগ্রহ করার কথাও বলেন।[২০] সপ্তম দলিলে তিনটি কর্মসূচির কথা বলেন—১. শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তোলা, ২. সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ৩. বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা; কারণ চারু মজুমদারের মতে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে সি. পি. আই. (এম) উপযুক্ত নয়।[২১] চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে লেখা হয় অষ্টম দলিলটি। এখানে সি. পি. আই. (এম) পার্টির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতি আক্রমণ আছে। তাদের পন্থাকে শ্রেণি-সহযোগিতার পথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে কৃষকদের মুক্তাঞ্চল গঠন, শ্রেণিশত্রুদের খতম ও তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং অস্ত্র চালানোর কৌশল রপ্ত করার কথা আছে। সেই সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতিতে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব কায়েম করার কথা বলা হয়েছে।[২২] অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকা, যেমন 'দেশহিতৈষী', 'কালপুরুষ', 'চিন্তা', 'নন্দন',

‘কমিউন’, ‘ছাত্রফৌজ’, ‘শলাকা’ ইত্যাদিতে প্রকাশিত দলিলগুলি তাত্ত্বিক-বিতর্কমূলক আলোচনা এবং সেগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃপার্টি সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য নিয়ে রচিত। সেখানে উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে চারু মজুমদারের দলিলগুলিতে তাত্ত্বিক আলোচনার থেকে প্রয়োগভিত্তিক ঝোঁক বেশি। এই দলিলগুলিতে চারু মজুমদারের রাজনৈতিক লাইন নির্দেশিত হয়েছে। ‘এগুলি দীর্ঘস্থায়ী তাত্ত্বিক বিতর্কমূলক আন্তঃপার্টি সংগ্রামের যতটা না হাতিয়ার, তার চেয়ে বেশি এগুলি উত্তরবঙ্গের নির্দিষ্ট এলাকায় কৃষক অভ্যুত্থানের বাস্তব কর্ম-নির্দেশিকা।’[২৩]

উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদার এবং তাঁর সঙ্গী কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরেন বসু অনেকদিন আগে থেকেই ‘জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব’-এর প্রচার করে যাচ্ছিলেন। ৭ মে ১৯৬৬ সালে গুরুতর অসুস্থতার জন্য চারু মজুমদার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দার্জিলিং জেলার পার্টির কর্মীদের সঙ্গে নিজের দলিল বিষয়ে মতামত নেওয়ার জন্য আলোচনা করতে শুরু করেন। জুন মাসের মধ্যে সেখানকার লোকাল কমিটির এক মিটিং-এ উনিশ জন সদস্যের মধ্যে বীরেন বসু ছাড়া সকলেই তাঁকে সমর্থন করেন।[২৪] চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সি. পি. আই. (এম) শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় যথাক্রমে সৌরেন বসু ও জঙ্গল সাঁওতালকে নির্বাচনের পদপ্রার্থী করে। নির্বাচনী প্রচারের সুযোগ নিয়ে চারু মজুমদারের পরামর্শে তাঁরা সেই অঞ্চলে বিপ্লবী রাজনীতি, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য ইত্যাদি ভাবনা ছড়িয়ে দিতে থাকল। স্লোগান তোলেন—‘বিপ্লব যাঁরা চান তাঁরা আমাদের ভোট দিন’।[২৫] নকশালবাড়ি আন্দোলনের পশ্চাৎপট এভাবেই তৈরি হয়েছিল।

এবার আসা যাক ২৫ মে নকশালবাড়ির ঘটনার বিবরণে। দার্জিলিং জেলার প্রায় ৩০০ বর্গমাইল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি। যেখানকার কৃষক সম্প্রদায় সাধারণত সাঁওতাল, ওঁরাও উপজাতি ও রাজবংশী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত চাষাবাদ করত নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী। জোতদাররা তাদের বীজ, লাঙল ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে ফসলের একটা বড় অংশ দাবি করত। আর তা পূরণে ব্যর্থ হলে জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ অবধারিত থাকত।[২৬] ফলে সামাজিকভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি কোনও দিন হয়নি। চারু মজুমদারের দলিলগুলিতে বর্ণিত রাজনৈতিক লাইন এই অঞ্চলের জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জঙ্গী লড়াইয়ের সাহস জুগিয়েছিল। ‘সব জমি

দখল করে নেব', 'গ্রামে আমরাই রাজত্ব করব' এরকম মনোভাব কৃষকদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল।[২৭] ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চা-শ্রমিকদের সংগ্রামে পুলিশের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই করার ঘটনা ঘটে। সে বছর অক্টোবর মাসে কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ নেতা গ্রেপ্তার হলেও কৃষকরা মহকুমা কৃষক কমিটির মধ্যে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয় সমস্ত জমির ধান কেটে তুলে নেওয়ার।[২৮] নির্বাচনের পর, ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস থেকেই বিভিন্ন এলাকার কৃষক সম্মেলন থেকে জমি দখলের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। ঠিক এরকম সময়ে চারু মজুমদার তাঁর অষ্টম দলিলটি লেখেন, যা কৃষকদের বিশেষ প্রভাবিত করে। ৭ মে বুড়াগঞ্জ-এর বাঁদরঝুলি গ্রামে মহকুমা কৃষক সম্মেলনে কানু সান্যাল ঘোষণা করেন—'কাল থেকে জমিদারী জোতদারী উচ্ছেদ হয়ে গেল এই এলাকায়, কাল থেকে লাঙলের ফালের দাগ দিয়ে জমির নতুন সীমানা তৈরি করে জমি বিলি করবে মহকুমা কৃষক সমিতি।'[২৯] ১৬ মে হরেকৃষ্ণ কোঙার উত্তরবঙ্গে এলাকা পরিদর্শনে যান এবং সেখানকার কৃষকনেতাদের ও জোতদারদের সঙ্গে মিটিং করে কারও প্রতি অন্যায় না হওয়ার আশ্বাস দিলেও তার কোনও সুরাহা হয়নি। ১৭ মে চৌপুখুরিয়া অঞ্চলের একটি মিটিং-এ সকলের হাতে অস্ত্র (তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি) না রাখার প্রস্তাব করলে কৃষকরা তার তীব্র বিরোধিতা করে।[৩০] এরপর লাগাতার চলতে থাকে জমি দখল, বন্দুক দখল, দলিলপত্র নষ্ট করে দেওয়া, জোতদারদের বাড়িতে হামলা।

২২ মে স্থানীয় প্রশাসন তীর-ধনুক বহন ও পাঁচ জনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ করে দেয়।[৩১] ২৪ মে আদালতের একটি নোটিসের জোরে জোতদার নগেন চৌধুরী ভাগচাষি বিগুল কিষাণকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে গেলে স্থানীয় কৃষক সমিতি তাতে বাধা দেয়। ফলে জোতদার পুলিশের শরণাপন্ন হলে সেদিনই এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়াংদি কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করতে আসেন। কিন্তু উদ্দীপ্ত কৃষকদের তীর-ধনুক নিয়ে পুলিশবাহিনীর ওপর আক্রমণে সোনাম ওয়াংদি মারা যান।[৩২] এরপরেই ঘটে ২৫ মে-এর ঘটনা। নকশালবাড়ির প্রসাদুজোতে একটি মহিলা সমাবেশ করেছিল বেঙ্গাই জোতের প্রহ্লাদ সিং ও তাঁর স্ত্রী সোনামতি সিং। সেই সমাবেশের উপর অতর্কিতে আসাম ফ্রণ্টিয়ারের পুলিশবাহিনী গুলি চালিয়ে এগারোজনকে হত্যা করে। তার মধ্যে সাত জন স্ত্রী ও দুটি শিশু ছিল। একটি শিশু ছিল প্রহ্লাদ সিং-এর স্ত্রীর পীঠে বাঁধা। রাইফেলের গুলি স্ত্রীকে ভেদ করে শিশুটিকেও মেরে ফেলে।[৩৩]

এই ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্র সমাজের কাছে রাজ্যের সরকার ও প্রশাসন প্রবলভাবে সমালোচিত হতে থাকে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিপ্লবকামী নেতা-কর্মীদের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করে এই ঘটনা। দক্ষিণবঙ্গে যাঁরা এতদিন আন্তঃপার্টি সংগ্রাম করছিলেন তাঁরা যেন নিজেদের পথের সন্ধান পেলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভিতরেও দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ২৯ মে সি. পি. আই. (এম.) নকশালবাড়ির ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করে। সি. পি. আই. (এম.)-এর ছাত্রসংগঠন নকশালবাড়ির এই ঘটনার প্রতিবাদে দেওয়ালে পোস্টার আঁটতে শুরু করে, স্লোগান তুলে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর পদত্যাগের। কিন্তু সরকারের অবস্থা বিপন্ন হতে থাকলে সি. পি. আই. (এম.)-এর নকশালবাড়ির পক্ষে সমর্থন থাকল না। জুন মাস ধরেই নকশালবাড়ি অঞ্চলে গেরিলা কৃষক-বাহিনী দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৮ থেকে ১০ জুনের মধ্যে সেখানে ৮০টি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে—যার মধ্যে ১৩টি ডাকাতি, ২টি হত্যা ছিল। ফলে সরকারের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যাবন লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচলা করেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার উত্তরবঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে আনার আবেদন নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি প্রেরণ করে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয় না।[৩৪] জুন মাসের শেষের দিকে সি. পি. আই. (এম.) নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে শুরু করে। এরকম পরিস্থিতিতে সি. পি. আই. (এম.)-এর ভিতরেও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে পার্টির একটি অংশের সমাবেশে গঠিত হয় 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'। সভাপতি হন প্রমোদ সেনগুপ্ত, সম্পাদক হন পরিমল দাশগুপ্ত এবং সহ-সভাপতি হন সুশীতল রায়চৌধুরী ও সত্যানন্দ ভট্টাচার্য। এখানেই তরাই অঞ্চল থেকে পুলিশ প্রত্যাহার, ধৃত কৃষকদের মুক্তির দাবি করা হয় এবং কৃষকদের জমির জন্য ন্যায় সঙ্গত দাবির দমনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ মোতায়নের তীব্র সমালোচনা করা হয়।[৩৫] এই সমস্ত কাজকর্ম সি. পি. আই. (এম.) পার্টির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছিল, পার্টির সাংগঠনিক চরিত্রে আঘাত হানছিল। ফলে শেষপর্যন্ত সি. পি. আই. (এম.)-এর রাজ্য কমিটি পার্টি স্বার্থ রক্ষার্থে পার্টি বিরোধিতায় যুক্ত ব্যক্তিদের বহিষ্কার অভিযান শুরু করে। ২০ জুন সুশীতল

রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত সহ মোট ১৯ জনকে এবং ৭ সেপ্টম্বর চারু মজুমদার, সৌরেন বসু সহ মোট পাঁচ জনকে বহিষ্কার করে।[৩৬]

এর মধ্যে ৫ জুলাই চিনের 'পিপলস ডেলি' পত্রিকায় 'Spiring Thunder over India' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে। সেখানে বলা হয়, ভারতীয় বিপ্লবের একমাত্র সঠিক পথ সশস্ত্র সংগ্রাম, অন্য কোনো পথ নেই। 'গান্ধিবাদ' বা 'সংসদীয় পথ' ইত্যাদি বুলি দিয়ে ভারতীয় শাসকশ্রেণি ভারতীয় জনগণকে পঙ্গু করে রেখেছে। সহিংস বিপ্লবের উপর আস্থা রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে তবেই ভারতের জনগণ সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করতে পারবে।[৩৭] সেখানে আরও বলা হয়, দার্জিলিং জেলার সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কিত। তাই তারা দার্জিলিং-এর কৃষক বিপ্লবকে বলেছে এটি 'জাতীয় বিপর্যয় হয়ে উঠবে'। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সশস্ত্র সংগ্রামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। দলত্যাগী ডাঙ্গে গোষ্ঠী এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শোধনবাদীরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে থাকা বিপ্লবী কর্মী এবং বিপ্লবী কৃষকদের নিন্দায় মুখর। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত অ-কংগ্রেসি সরকার প্রকাশ্যে ভারত সরকারের পক্ষ নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে দার্জিলিং-এর কৃষক সংগ্রামকে দমানোর চেষ্টা করছে। এটাই প্রমাণ করে যে, এই দলত্যাগী ও শোধনবাদীরা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েতের শোধনবাদের কুকুর এবং ভারতীয় ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের দালাল।[৩৮] পিকিং রেডিও ক্রমশ নকশালবাড়ির ঘটনার প্রচার ও সমর্থন করে যাচ্ছিল। চিনের এই সমর্থন সি. পি. আই. (এম.)-এর মধ্যেকার বিপ্লবী অংশকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়।

অবশেষে সুশীতল রায়চৌধুরী ১১ নভেম্বর ১৯৬৭ সালে শহীদ মিনারের ময়দানে চারু মজুমদারকে প্রধান বক্তা করে একটি জনসভা ডাকেন। সেখানে ছাত্র, যুব, বিক্ষুব্ধ কমিউনিস্টরা যোগ দেয়। চারু মজুমদার এই সভাতেই নকশালবাড়ির নেতা হিসেবে নিজেকে নয়, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কদম মল্লিক, খোকন মজুমদারের নাম করেন এবং বলেন, 'নকশালবাড়ীর কৃষক জমি বা ফসলের জন্য লড়াই করেনি, তারা লড়াই করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য।...এই সংগ্রাম কৃষকরা গড়তে পেরেছিল কেবলমাত্র সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই।'[৩৯] ১৩ নভেম্বর সারা ভারতের সি পি আই (এম)-এর বিক্ষুব্ধ সদস্যদের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'

একটি 'কনভেনশন' করে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটি' (AICCCR of CPI (M)।[৪০] এই কমিটি প্রধান কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়—নকশালবাড়ি ধরনের কৃষক সংগ্রাম সর্বস্তরে গড়ে তোলা ও সমন্বয় সাধন করা, সংশোধনবাদ ও নয়া-সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী ভারতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিপ্লবী কর্মসূচি তৈরি করা।[৪১]

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন :

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যেই তাতে ভাঙনের লক্ষণ দেখা দেয়। খাদ্যসংকটকে কেন্দ্র করে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষের সম্পর্ক খারাপ হয়। অজয় মুখার্জীর সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভালো ছিল না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের সমর্থনে কমিউনিস্ট বর্জিত নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাইতেন। এ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গেও আলোচনা করেন। আবার বাইরে থেকে কংগ্রেসও বিভিন্নভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক দলগুলির মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। রাজ্যও তখন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র আন্দোলনে জর্জরিত। এরকম পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত ঠিক হয় ২ অক্টোবর অজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের সমর্থনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।[৪২] কিন্তু শেষপর্যন্ত সেদিন তা ঘটেনি।

পদত্যাগের পরিকল্পনা এত দূরই এগিয়েছিল যে অজয় মুখার্জী পদত্যাগের কারণ নিয়ে একটি বিবৃতিও তৈরি করেন। যেখানে তিনি সেসময়ের কতগুলি জটিল সমস্যা ও অভিযোগের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিযোগ মূলত ছিল সি পি আই (এম) ও তার সহযোগীদের উপর। মুখ্যমন্ত্রীর মতে তারা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের দিয়ে ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের শিল্পকে ধ্বংস করছে। যার ফলে রাজ্যে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল অতিবামপন্থা তথা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সি পি আই (এম)-এর একটি অংশের দিকে। যারা মনে করে ভারতে বিপ্লবের সময় এসে গেছে। চিনের সহযোগিতায় তারা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাতে চায়। ফলে ভবিষ্যতের চরম

সংকটের আশঙ্কা করে অজয় মুখার্জী সেই বিবৃতিতে লেখেন, 'আমি মনে করি এই রকম পার্টিকে এবং তার সহোযোগীদের সরকারি মন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও সেই সঙ্গে আমার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করছি। দেশপ্রীতির প্রেরণাতেই আমি এই পদত্যাগপত্র পেশ করছি'।[৪৩]

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর সঙ্গে আরও ১৮ জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন।[৪৪] সেজন্য রাজ্যপাল ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রীকে ২৩ নভেম্বর বিধানসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ১৮ ডিসেম্বরের আগে তা করতে না চাইলে শেষপর্যন্ত ২১ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যপাল বাতিল ঘোষণা করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে 'পিপলস ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' সরকার গঠন করেন। যাকে বাইরে থেকে সমর্থন করে কংগ্রেস।[৪৫] এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে বেশ কিছুদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ-মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট, বন্ধ পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বাধে। ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ থেকে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৫০,০০০ এর বেশি মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিল।[৪৬] শেষপর্যন্ত ১৪ ফেব্রুয়ারি স্পিকার বিজয় ব্যানার্জি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাতিল এবং পি. ডি. এফ. সরকারের গঠন সবকিছুই আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিধানসভা মুলতবি রাখেন।[৪৭] ফলে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালে প্রফুল্ল ঘোষের পি. ডি. এফ. মন্ত্রীসভা নিরুপায় হয়ে পদত্যাগ করে এবং রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।[৪৮]

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার :

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর এক বছর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকে। এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেদের বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার আন্দোলন করে এবং তা দমনে পুলিশ প্রশাসনও সক্রিয় হয়ে উঠে। আর অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত একাধিক শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের মুক্ত করে।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন ঘোষিত হয়। এই নির্বাচনে চারু মজুমদার প্রমুখ বিপ্লবী কমিউনিস্টরা ভোট বয়কটের ডাক দেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে কো-অর্ডিনেশন কমিটির আলোচনায় 'নির্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাব' নামে একটি বিবৃতি দেয়। যেটি 'দেশব্রতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে বলা হয়—

> '...বুর্জোয়া সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, যা পূর্বেই ঐতিহাসিকভাবে অচল হয়ে গেছে, বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে সাধারণভাবে এবং ভারতের মত আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ ভারতের মতো দেশ বুর্জোয়া নয়, সামন্তবাদী।...নকশালবাড়ি ভারতে সংসদীয়বাদের কবর রচনা করেছে। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ সংসদীয়বাদের পাকে ডুবে ছিলেন। তারা এখন আলো দেখতে পেয়েছেন, তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন যে, নকশালবাড়ির পথই তাদের মুক্তির একমাত্র পথ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের দালাল বিশ্বাসঘাতক ডাঙ্গেচক্র ও নয়া-সংশোধনবাদীরা নকশালবাড়ি দেখে সঙ্গতভাবেই ভীত হয়ে উঠেছে। তাই নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গ যাতে দাবানলে পরিণত হতে না পারে, সেইজন্য তারা আজ প্রাণপণ শক্তিতে নির্বাচন ফেরি করছে।'[৪৯]

চারু মজুমদার বলেন—

> '...যখন বিশ্ববিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে—সেই যুগে সংসদীয় পথে পা বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্লবের এই অগ্রগতিকে রোধ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সংসদীয় পথ আজ বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এটা ঔপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে যেমন সত্য ধনতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও তা একই রকম সত্য। বিশ্ববিপ্লবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সর্বহারা শ্রমিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জয়লাভ করছে তখন বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একটি কাজই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা

> হোল গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে দৃঢ় ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা। তাই সমগ্র যুগ ধরে বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের আওয়াজ হবে 'নির্বাচন বয়কট করো' এবং গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা বানাও। সংসদীয় পথে চলে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা বহু রক্তের ঋণ জমা করেছেন, আজ দিন এসেছে সেই ঋণ শোধ করার।'[৫০]

তবে এসব প্রচার নির্বাচনে তেমন কোনও প্রভাব ফেলেনি।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি নির্বাচনের পূর্বে জোট বাঁধতে পারেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে আর তা হল না। নির্বাচন হওয়ার আগেই যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল। ফলে এবার লড়াই হয় দ্বিমুখী—কংগ্রেস বনাম যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট ৩২ দফা সম্বলিত নির্বাচনি ইস্তেহার প্রকাশ করে। যেখানে কৃষি-সেচ, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমিসংস্কার, খাদ্যসমস্যা, প্রশাসন, পুনর্বাসন, শ্রমিকদের জীবনের মানোন্নয়ন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫১] শেষপর্যন্ত ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য আসে—২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রস পায় মাত্র ৫৫টি আসন, আর যুক্তফ্রন্ট পায় ২১৮টি আসন। সি পি আই (এম) ৮০টি আসনে জয়লাভ করে বৃহত্তর দল হয়।[৫২] তবে এবারও মুখ্যমন্ত্রী হন অজয় মুখার্জী। জ্যোতি বসু পান উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ এবং সাধারণ প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম কর্মসূচি ছিল ভূমিসংস্কার। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই কাজে স্মরণীয় হয়ে আছে। সারা রাজ্যে বেনামি জমি উদ্ধার ও তার বণ্টনে এই সরকার বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। জ্যোতি বসু জানিয়েছেন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় প্রায় আট লক্ষ বিঘা জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকরা দখল নিতে পেরেছিল।[৫৩] ১৯৬৭ আগস্ট থেকে ১৯৬৯ মে পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার মোট ২,১৫,৩৮৯,৪৫ একর জমি উদ্ধার করতে পেরেছিল।[৫৪]

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের তুলনায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেক বেশি আসন জয় করেছিল। বিধানসভার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সরকার তেরো

মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারিনি। এর পিছনে একটা বড় কারণ ছিল শরিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ। বেশিরভাগ সংঘর্ষ হয়েছিল সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে অন্যান্য শরিক দলের। এই সরকারে বড় দল হওয়ায় সি পি আই (এম)-এর হাতেই ছিল অধিক ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে বরুণ সেনগুপ্ত বলেছেন,

> 'এই বড় ভাবটা গোড়া থেকেই সি পি এমের নেতা কর্মীদের আচরণে ফুটে উঠল। বড় দলের দাবিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীত্ব চাইলেন, বড় দলের দাবিতে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিলেন এবং বড় দল বলেই 'ডোন্ট কেয়ার' ভাবটা বেশি করে এল। সি পি এম নেতা ও কর্মীরা তাই গোড়া থেকেই টপ গিয়ারে চলতে শুরু করলেন।'[৫৫]

নিজেদের সংগঠন বাড়াতে গিয়ে অন্যান্য শরিক দলের এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্রিয় হলেই বাধত সংঘর্ষ। সেই সব সংঘর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টির একাধিক কর্মী-সমর্থক মারা যায়, একাধিক আহত হয়েছে। যেমন মে মাসে আলিপুরদুয়ারে সি পি আই (এম) বনাম আর এস পি-এর মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচ জন মারা যায়[৫৬], নভেম্বরে সি পি আই (এম) বনাম সি পি আই-এর সংঘর্ষে তিনজন সি পি আই কর্মী এবং কোচবিহারে সি পি আই (এম) বনাম ফরওয়ার্ড ব্লকের সংঘর্ষে দুজন মারা যায়[৫৭] ইত্যাদি। এই সব শরিকি সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য ফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে একাধিক বৈঠক, আলোচনায় অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষ মেটেনি। এছাড়াও এই সময় নকশাল আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং নকশাল কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'খতমের অভিযান' চালাতে থাকে। ফলে রাজ্যের শান্তি নানাদিক দিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং তা সমাধানের জন্যও যুক্তফ্রন্ট সরকার তেমন কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও ক্রমশ পতনের অভিমুখে যেতে থাকে। রাজনৈতিক বড়ো মোড় নেই যখন 'আইন-শৃঙ্খলা' বিপন্ন এই অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই ১৯৬৯ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে কার্জন পার্কে অনশনে বসে।[৫৮] এই অনশন মূলত ছিল সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত অজয় মুখার্জী সহ বাংলা কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়ক পদত্যাগ করে ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। অবশেষে ২৯ মার্চ রাজ্যে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। কিন্তু বিধানসভা ভাঙা হয়নি।[৫৯]

সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর প্রতিষ্ঠা ও নকশাল আন্দোলনের বিস্তার :

'AICCCR of CPI (M)'-এর সদস্যরা নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের ১৪ মে এক বৈঠকে মিলিত হয়। প্রথমে রাখা কমিটির নামে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে যোগ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এই বৈঠকে সেই যোগসূত্র বাদ দিয়ে নাম রাখা হয় 'AICCCR' এবং রচনা করা হয় 'দ্বিতীয় ঘোষণা' নামে একটি দলিল। এই দলিলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, ভারতের বৃহৎ জমিদারশ্রেণি এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণিকে ভারতীয় জনগণের প্রধান চারটি শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০]

এতদিনে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ১৯৬৮ সালে মেদিনীপুর জেলার ডোবরা ও গোপীবল্লভপুর এলাকায় কৃষক সংগঠক ভবদেব মণ্ডল ও গুণধর মুর্মূ নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে কৃষকদের ফসল ও জমি দখলের আন্দোলন শুরু করেন। তার আগে ১৯৬৭ সালে গোপীবল্লভপুরে সন্তোষ রাণা 'নব যুবক' নামে স্থানীয় ছাত্র-যুবদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। সেখানে পরবর্তীকালে অসীম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ছাত্রদল যোগ দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে টি. নাগী রেড্ডী, ভি. ভি. রাও, চন্দ্র পুল্লা রেড্ডীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অন্ধ্রপ্রদেশ কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কমুনিস্ট রেভিউলুশনারিজ' (APCCCR)। বিহারের মুজফ্ফরপুর জেলার মুশাহারী অঞ্চলে সত্যনারায়ণ সিং প্রমুখ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে কৃষক সংগ্রাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্মীমপুর খেরি অঞ্চলে শিবকুমার মিশ্র প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লবী কমিউনিস্টরা নকশালবাড়ির আদলে কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলেন ইত্যাদি। এরকমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আন্দোলন ও গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে একটি ছাতার তলায় আনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পার্টি গঠনের প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও দরকার ছিল একটি সর্বভারতীয় পার্টির। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই সি পি আই (এম, এল)-এর গঠন হয়।

চারু মজুমদারের উদ্যোগে 'AICCCR' ১৯৬৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'It is Time to Form the Party' শিরোনামে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যেখানে ঘোষণা করা হয়—

> 'At a time when Communist revolutionaries all over the country have given priority to the task of building revolutionary bases in the rural areas, at a time when the slogan of revolutionary class struggle is rending the sky, it is our immediate duty to form a revolutionary Party without which the advance of revolution is sure to be impeded.'[৬১]

সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সালে কানু সান্যাল তাঁর 'তরাই-এর কৃষক আন্দোলনের রিপোর্ট' নামে খ্যাত পর্যালোচনায় পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।[৬১] ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে চারু মজুমদার 'দেশব্রতী' পত্রিকায় পার্টি গঠনের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখেন 'কেন এখনই পার্টি গঠন করতে হবে'। সেখানে তিনি বলেন—

> '...দরকার একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির, যা হবে সর্বভারতীয় সংগঠন। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের বিপ্লবী কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি নিশ্চয়ই শ্রেণীসংগ্রামের নিখুঁত হাতিয়ার নয়, কারণ কো-অর্ডিনেশন কমিটি কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতেই কাজ করতে পারে, সেখানে কোনোরকম কেন্দ্রিকতা থাকতে পারে না, তাই কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে না। বৈপ্লবিক শৃঙ্খলাবোধ না জাগাতে পারলে শ্রেণীসংগ্রামের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা যায় না। ফলে সংগ্রামের ধার থাকে না।'[৬২]

সেই সূত্রেই অবশেষে ২৫ এপ্রিল কলকাতার শিয়ালদহ রেল স্টেশনের কাছে টাওয়ার লজে কো-অর্ডিনেশন কমিটির অধিবেশন ডাকা হয়। ২৭ এপ্রিলের অধিবেশনে সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর এগারো জনের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল-ই মূলত পার্টি গঠনের তারিখ, কিন্তু লেনিনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল

দিনটিকে পার্টি গঠনের দিন হিসেবে ঘোষণা তাঁরা করে।[৬৩] পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাবে মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা ও জনযুদ্ধের নীতি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর উপর গঠিত এই পার্টির মূল লক্ষ্য হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা।[৬৪] ১ মে শহীদ মিনারের ময়দানে জনসমক্ষে পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন কানু সান্যাল।[৬৫] কিন্তু সেদিন প্যারেড গ্রাউন্ডে সি পি আই (এম)-এরও একটা জনসভা থাকায় দুই পার্টির মধ্যে একটি সংঘর্ষ বাঁধে। যা থামাতে পুলিশকেও সক্রিয় হতে হয়। পরে দেশব্রতী পত্রিকায় জনসভায় দেওয়া কানু সান্যালের বিবৃতিটা 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো' শিরোনামে প্রকাশ পায়। তার পরেই কলকাতার অনেক দেওয়ালেই লেখা হয় 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো'।[৬৬] ২ জুলাই পিকিং রেডিও থেকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই. (এম. এল.)-কে স্বীকৃতি দেয়।[৬৭]

২১ আগস্ট 'দেশব্রতী' পত্রিকায় শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে 'ছাত্র যুবদের কাছে পার্টির আহ্বান' শিরোনামে চারু মজুমদার প্রবন্ধ লেখেন।[৬৮] সেই মাসেই অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রাণা প্রমুখ ছাত্র-যুব সি. পি. আই. (এম. এল.)-এ যোগদান করেন।[৬৯] এর পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জোতদার, জমিদার, মহাজনরা নকশালদের হাতে খুন হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে প্রায় ৩০টি 'খতম অভিযান' ও 'গেরিলা অ্যাকশন'-এর বর্ণনা 'দেশব্রতী' পত্রিকায় ছাপা হয়।[৭০] শুধু জোতদার, মহাজনরাই নয় সি পি আই (এম)-এর কর্মীরাও মারা যায় নকশালদের হাতে—যেমন ১৩ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্তরে যুবকর্মী কৃষ্ণ রায়, ১৫ মে আলিপুরদুয়ারে যুবকর্মী বাদল দত্ত।[৭১]

২২ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় চারু মজুমদার তাঁর ''৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন' লেখায় পার্টি ক্যাডারদের প্রতি এলাকা ভিত্তিক খতম অভিযান চালানোর কথা ঘোষণা করলেন।[৭২] 'সত্তরের দশক হবে মুক্তির দশক' এই আহ্বান তরুণদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পশ্চিমবঙ্গেই তার মাত্রা বেশি। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হতে থাকে—'গ্রামে গ্রামে জোতদার জমিদার খতম চলছে, চলবে', 'চিনের চিয়ারম্যান আমাদের চিয়ারম্যান', 'চিনের পথ আমাদের পথ', 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' ইত্যাদি স্লোগান। এইভাবে নকশাল রাজনীতি ক্রমশ উগ্রপন্থায় পৌঁছে যায়। শুধু জমিদার জোতদাররাই নয়, সেই সঙ্গে তাদের আক্রমণ নেমে আসে সাধারণ

পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, সি পি আই (এম) ক্যাডার, অসাধু ব্যবসায়ী, সুদখোর, বিরোধী রাজনীতির লোক, এমনকি সরকারি কর্মচারী ও আধিকারিকদের উপর। সি. পি. আই. (এম)-এর বহু কর্মী-সমর্থক নকশালপন্থীদের আক্রমণে মারা যায়। যেমন, দমদম লোকাল কমিটির নেতা জীবন মাইতি, যুবকর্মী অরুণ মণ্ডল, বরানগর বনহুগলী অঞ্চলের শ্রমিক কর্মী বিজন সাহা, নদীয়ার ছাত্র নেতা প্রশান্ত সরকার, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র নেতা মোহনলাল ঘোষ প্রমুখ।[৭৩] নকশালদের এই 'খতম অভিযান'-এ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন এবং ১২ জানুয়ারি ১৯৭১-এ বেলুড় পলিটেকনিক-এর অধ্যাপক সত্যেন চক্রবর্তীও খুন হয়।[৭৪]

নকশালরা এসময় আর একটি বিতর্কিত অভিযান চালাতে শুরু করে। তারা বিপ্লবের নামে প্রথাগত শিক্ষার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে গিয়ে স্কুল কলেজে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে এবং প্রচলিত ঐতিহ্যের মুখে পদাঘাত দিতে বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি ভাঙতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধির মূর্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এইসব কার্যকলাপ ক্রমশ নকশালদের সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা বিপ্লবী থেকে ক্রমশ সমাজবিরোধীতে পরিণত হতে থাকে। নকশালদের অন্দরেও এই ভাঙচুর নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়—সুশীতল রায়চৌধুরী এর বিরোধিতা করেন।[৭৫] কিন্তু সরোজ দত্ত এর পূর্ণ সমর্থন করে গেছেন। তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন—

> 'যারা মূর্তি ভাঙ্গছে তারা সবাই সি পি আই (এম-এল)-এর সদস্য নয়। পার্টির ছাত্র, যুবকেরা পার্টির নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই পার্টি লাইন ও জনতার মেজাজ অনুযায়ীই এই আন্দোলন শুরু করেছে যা আজ তরুণের বিশাল বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে রাজনৈতিক ভাবার্থ বুঝেই কি এরা একাজ করছে? বিপ্লবী জনগণ সব সময়ে তার কাজের রাজনৈতিক ভাবার্থ বুঝে সংগ্রাম করে না। যাঁদের মূর্তি যুবকেরা ভাঙ্গছে, তাঁদের অতীতের কার্যকলাপ কি এরা জেনেছে? না, জানেনি। তা সত্ত্বেও এরা ঠিক কাজই করেছে। তারা বিপ্লবের বিজয়ের যুগেই জন্মেছে ও বেড়ে উঠেছে। তারা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত সংশোধনবাদী অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না যে মূর্তিগুলির সব দিক ওজন

করে বিচার করবে? তাদের দৃষ্টিও তো বয়োজ্যেষ্ঠদের মত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নেই।'[৭৬]

এভাবেই হিংসাত্মক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নকশালরা সাতের দশকের সূচনা করে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনও তা দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেয়। ফলে নকশাল আন্দোলন লক্ষ্য পূরণের পথে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। ১৯৭২ আসতে আসতেই তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ও ১৯৭১-এর নির্বাচন :

একদিকে 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত কর' এই সঙ্কল্প নিয়ে নকশালপন্থীদের শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান, অন্যদিকে সংসদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রশাসনও সক্রিয় হয়। রাজ্য জুড়ে চলে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ, সি. আর. পি., বি. এস. এফ. ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দু'লক্ষ সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়ন করা হয়েছিল।[৭৭] ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে কংগ্রেসের ভাঙন ঘটলে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের প্রভাব কমতে থাকে আর ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। একটা বড় অংশের ছাত্র-যুব ইন্দিরা-কংগ্রেসে যোগ দেয়, যারা প্রবলভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল। নকশালবাদী ছাত্র-যুবদের পাশাপাশি এঁদের সংখ্যা ও দাপাদাপি নিছকই কম ছিল না।[৭৮] তাদের হাতে ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতা। ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শুরু হয় কংগ্রেস ও তার সমর্থনে থাকা অন্যান্য দল, সি পি আই (এম) ও তার সমর্থনে থাকা অন্যান্য দল এবং নকশালপন্থীদের মধ্যে এক ত্রিমুখী লড়াই। রাজ্যজুড়ে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, ধর্ষণ, পথেঘাটে-জেলে খুন সে সময়ের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। জ্যোতি বসু জানাচ্ছেন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে ১৯৭১-এর নভেম্বর পর্যন্ত ৫৪৩ জন সি. পি. আই. (এম.) নেতা, কর্মী, সমর্থক খুন হয়েছে।[৭৯] ২৭ নভেম্বর ১৯৭০-এ পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানায়, গত তিন মাসে কলকাতায় ১২০ জন এবং কলকাতা বাদে সারা পশ্চিমবঙ্গে ২৭১ জন খুন হয়েছে।[৮০] ২০ নভেম্বর বারাসাতের আমডাঙা অঞ্চলে হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ১১ জন যুবকের লাস পাওয়া যায়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ২৬ জানুয়ারি

১৯৭১ সালে ডায়মন্ডহারবারে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গঙ্গার ধারে ৬টি তরুণের মৃতদেহ পাওয়া যায়।[৮১] জেলের মধ্যেও পুলিশি নির্যাতন চরম পর্যায়ে উঠে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ মেদিনীপুর জেলে ১৬ জন নকশাল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।[৮২]

এরকম সন্ত্রস্ত পরিবেশে ১০ মার্চ ১৯৭১ সালে নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। জ্যোতি বসু বলছেন—

> 'ঊনসত্তরের নির্বাচনের তুলনায় সেবারের নির্বাচনে একটি গুরুতর পার্থক্য ছিল। সেবার সকল বামপন্থী দল ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেস-বিরোধিতা করছিল। কিন্তু এবার কিছু দল প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের পক্ষ নিয়েছিল। কিছু দল প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সাথে যেতে পারছে না বলে আট পার্টির জোট তৈরি করে তাকে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট হিসেবে দেখাতে চাইছিল—যার আসল উদ্দেশ্য ছিল সি পি আই (এম)-কে বিচ্ছিন্ন করা।'[৮৩]

এই নির্বাচন ঘিরে সন্ত্রাসের পরিবেশ চরম মাত্রা নিয়েছিল। নকশালদের নির্বাচন বিরোধিতার ডাক আগের নির্বাচনে তেমন প্রভাব না ফেলতে পারলেও এবার তা যথেষ্ট জোরালো হয়। তারা প্রকাশ্যেই নির্বাচন প্রার্থীদের খতম করার হুমকি দেয়। জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন, সি পি আই (এম) ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টকে হারানোর জন্য কংগ্রেস একেবারে বেপরোয়া হয়ে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। সি পি আই (এম) পার্টির শক্ত ঘাঁটিগুলিতে পুলিশ 'চিরুনি অভিযান' করে অথচ কংগ্রেসের ঘাঁটিতে কোনও তল্লাশি হয়নি। 'চিরুনি অভিযান'-এর সময় কংগ্রেসি গুন্ডারা পুলিশি বেস্টনিতে এসে চরম অত্যাচার করত। ফলে কোনো রকম প্রচার বা পোস্টার লাগানো সি পি আই (এম)-এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সব অত্যাচারের মধ্যে ১৯৭১-এর জানুয়ারি থেকে ৯ মার্চের মধ্যে ৭০ জন সি পি আই (এম) কর্মী, সমর্থক খুন হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।[৮৪]

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হেমন্তকুমার বসু ছুরিকাঘাতে নিহত হন।[৮৫] এই খুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে। সংবাদ মাধ্যম এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সি পি আই (এম)-এর দিকে অভিযোগের তীর ছোঁড়েন। কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম তার প্রতিধ্বনি করে এবং 'মিডিয়া ট্রায়েল'-করে সি পি আই (এম)-কেই দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু

শেষপর্যন্ত এই খুনের পিছনে নকশালদের হাত প্রমাণিত হয়।[৮৬] এই মাসেই বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের অভ্যান্তরে পুলিশের লাঠিচার্যে সাতজন বন্দি নিহত হয়।[৮৭] এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনের নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে আসে। পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহীর প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা সাংবাদিক সম্মেলন করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সেনাবাহিনীর সামনে যদি কোনও আইনভঙ্গের কাজ হয় তাহলে সেনাবাহিনী তৎক্ষণাৎ গুলি চালাবে।[৮৮]

শেষপর্যন্ত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে দেখা যায়, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ১২৩টি আসন লাভ করে—যার মধ্যে একাই সি পি আই (এম) ১১১টি আসন পেয়ে পুনরায় বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। কংগ্রেস পায় ১০৫টি, আট পার্টির জোট (সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ইত্যাদি) পায় ২৫টি এবং অন্যান্যদের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস পায় ৫টি।[৮৯] বৃহত্তর দল হওয়া সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-কে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বদলে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন ৫ আসনে জয়ী বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী। তাঁকে একযোগে সমর্থন করল কংগ্রেস ও আট পার্টির জোট।[৯০] উপরন্তু তিনি এই নির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।[৯১] কিন্তু এই সরকারও তিন মাসের বেশি টিকল না। অবশেষে জুন মাসে অজয় মুখার্জী ইস্তাফা দেন এবং তৃতীয় বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

তৃতীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ও ১৯৭২-এর নির্বাচন :

আগের রাষ্ট্রপতি শাসনের সঙ্গে এই রাষ্ট্রপতি শাসনের পার্থক্য ছিল। এবার সমস্ত ক্ষমতাভার রাজ্যপালের উপর রাখা হয়নি। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা তদারক করার জন্য কেন্দ্রের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে ইন্দিরা গান্ধি দপ্তরবিহীন তদারকি মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে পাঠায়।[৯২] এক কথায় রাষ্ট্রপতি শাসন বকলমে পরিণত হয় কংগ্রেসি শাসনে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই 'বরানগর-কাশীপুর হত্যাকাণ্ড' ঘটে।

১৯৭১ সাল জুড়ে কলকাতা শহরে নকশালরা হত্যালীলায় মেতে উঠে। 'শ্রেণিশত্রু খতম' এবং 'মুক্তাঞ্চল' গঠনের নেশায় তারা উন্মত্ত। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তারা বুর্জোয়া

আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন 'সিস্টেম'-এর সঙ্গে যুক্ত যেকোনও ব্যক্তিকে তারা হত্যা করত। যেমন 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সুচারুকান্তি ঘোষ, হাইকোর্টের বিচারপতি কিরণলাল রায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অজিত বিশ্বাস, মধ্য কলকাতার যুব-কংগ্রেস নেতা নারায়ণ কর, সেন্ট্রাল এক্সাইজের প্রশাসনিক অফিসার এন. কে. পাল প্রমুখ নকশালদের হাতে খুন হয়। রুণু গুহনিয়োগী বলেছেন ১৯৭১ সালে কলকাতায় নকশালদের হাতে খুন হয়েছে কংগ্রেসের ১৭ জন, সি. পি. আই. (এম.)-এর ২৫ জন, সি. পি. আই.-এর ১ জন, পি. এস. পি.-এর ১ জন, হোমগার্ড ৭ জন, ব্যবসায়ী ৬ জন, পুলিশ ১৬ জন, অন্যান্য মানুষ ৩৭ জন।[৯৩]

এই সময় উত্তর কলকাতার সিঁথি-বরানগর-কাশীপুর অঞ্চল নকশালদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ছিল। প্রতিনিয়ত এখানে খুনখারাপি লেগেই থাকত এবং সেজন্য বারবার পুলিশ প্রবেশ করত। তবে এই এলাকায় সব থেকে বড়ো ঘটনা ঘটে আগস্ট মাসে। ঘটনার সূত্রপাত হয় ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা নির্মল চ্যাটার্জীর হত্যাকে কেন্দ্র করে। এই হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই কংগ্রেস পার্টির সহযোগিতায় 'লোকাল' গুন্ডার দল সেই অঞ্চলে প্রবল তাণ্ডব চালায়। রুণু গুহনিয়োগী জানাচ্ছেন, কংগ্রেস নেতা গণপতি শূরের নেতৃত্বে শত ঘোষের লোকেরা এবং সেই এলাকার 'নবজীবন সংঘ'-এর (একটি স্থানীয় সংগঠন) ছেলেরা সাধারণ মানুষকে আইন হাতে তুলে নিয়ে নকশাল সাফাই অভিযানের ডাক দেয়। নকশালদের ক্রবর্ধমান সন্ত্রাস সাধারণ জনগণকেও নকশালদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে। ফলে তারাও সেই ডাকে সাড়া দেয়; এমনকি তারা 'নকশাল তাড়াও, নকশাল মার' শ্লোগান তোলে। ১২ আগস্টের রাত থেকে শুরু হল সিঁথি-বরানগর-কাশীপুর—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দুদিন ব্যাপী নকশাল খতমের অভিযান। সি. পি. আই. (এম.) ক্যাডাররাও সেই অভিযানকে সমর্থন জানায়। কারণ নকশালদের খতম অভিযানে তারাও বলি হচ্ছিল।[৯৪] এই অভিযানে কতজন খুন হয়েছে তার সঠিক কোনও হিসেব নেই। জ্যোতি বসু জানিয়েছেন খুনের সংখ্যা প্রায় ৪০-এর উপর এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে।[৯৫] তবে দুদিন ব্যাপী ঘটে যাওয়া এই নরমেধ যজ্ঞ থামাতে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ছিল সত্যিই লজ্জাজনক।

পশ্চিমবঙ্গ এরকম সন্ত্রস্ত পরিস্থিতির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে অনেক টালবাহানার পর ১১ মার্চ ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়।

এবারের নির্বাচন মূলত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—একদিকে কংগ্রেস ও সি. পি. আই.-এর জোট এবং অপরদিকে সি. পি. আই. বাদে সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলির জোট। আর. এস. পি., এস. ইউ. সি., ফরওয়ার্ড ব্লকও সেই জোটে শামিল হয়—যারা ১৯৭১-এর ভোটে সি. পি. আই. (এম.)-এর সঙ্গে ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব জয় দেখা যায়—কংগ্রেস পেয়েছিল ২১৬টি, সি. পি. আই. জয়ী হয়েছিল ৩৬টি আসনে এবং সি. পি. আই. (এম.) মাত্র ১৪টি আসন পায়।[৯৬]

এই নির্বাচনে কংগ্রেসের এরকম সাফল্য এবং সি. পি. আই. (এম.)-এর ব্যর্থতা সন্দেহের অবকাশ তৈরি করে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকেই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একদিকে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশ কমেছে তো অন্যদিকে সি. পি. আই. (এম.)-এর প্রভাব বেড়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে এক বছরের ব্যবধানে বিস্তর ফারাক সন্দেহ করার মতো। কংগ্রেস ১০৫ আসন থেকে পৌঁছেছিল ২১৬ তে এবং সি. পি. আই. (এম.)-এর আসন ১১১ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪ তে। এমনকি এই নির্বাচনে জ্যোতি বসু নিজেও চল্লিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন সি. পি. আই.-এর এক অতি কম পরিচিত প্রার্থীর কাছে—যে জ্যোতি বসু ১৯৭১ সালের নির্বাচনে অজয় মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন। নির্বাচনের এরকম ফলাফলের কারণ হিসেবে কংগ্রেসের মদতে ব্যাপক রিগিং-এর অভিযোগ তোলে বামপন্থীরা।

এই সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই কংগ্রেসি গুন্ডাদের অত্যাচার লাগামহীন ছিল এবং পুলিশ প্রশাসনও তাদের পক্ষে থেকেছে। ফলে নির্বাচন ঘোষণার সময় থেকেই রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের মাত্রা প্রবল হয়। বামপন্থী দলের প্রার্থী-কর্মী-সমর্থকদের হামলা, খুন এবং অত্যাচারের মাধ্যমে এলাকাছাড়া করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি টালিগঞ্জের সি. পি. আই. (এম.) প্রার্থী প্রশান্ত শূরকে লক্ষ করে গুলি করা হয়; একটুর জন্য তিনি রক্ষা পান, কিন্তু সেই গুলিতে একজন তরুণ কর্মী মারা যায়; সি. আই. টি. ইউ. নেতা হরিদাস মালাকার এবং কুলতলীর সি. পি. আই. (এম.) প্রার্থী প্রবোধ পুরকায়েতকে অপহরণ করা হয়; সোনারপুর কেন্দ্রে সি. পি. আই. (এম.) প্রার্থী গঙ্গাধর নস্কর মিছিল করতে গিয়ে আক্রান্ত হন; রায়গঞ্জের সি. পি. আই. (এম.) প্রার্থী মানস রায়ের বাড়ি তছনছ করে দেয় কংগ্রেসিরা।[৯৭]

জ্যোতি বসু নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চকে ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের এক 'কালা দিন' বলেছে।[৯৮] ৭ এপ্রিল ১৯৭২ সালে নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বামপন্থী দলগুলি যৌথভাবে ১৯৭২-এর নির্বাচন নিয়ে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করে। সেখানে ভোট গ্রহণের দিন কংগ্রেস, সি. পি. আই. ও পুলিশ প্রশাসন দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাসের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। সেখানে জানানো হয়েছিল—কোনও কোনও ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড, জখম ও সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত হয়। গাড়িতে করে শাসক কংগ্রেসের 'স্বেচ্ছাসেবক'-দের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ শাসানি; বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটিগুলি ছাড়া অন্যত্র প্রায় সর্বত্র রাস্তা থেকে সামরিক বাহিনীর টহল প্রত্যাহার করা হয়েছিল। অনেক বামপন্থী কর্মী ও ভোটারদের উপর গুলিবর্ষণ, ছুরিকাঘাত এবং অপহরণ করা হয়। শাসক কংগ্রেস ও সি. পি. আই.-এর 'স্বেচ্ছাসেবক'-দের প্রতি পুলিশ-প্রশাসনের ঢালাও সমর্থন যে আছে তা প্রদর্শন করা। এই 'স্বেচ্ছাসেবক'-রা পোলিং বুথগুলি দখল করে, তাদের সংখ্যা বহু স্থানেই সাদা পোশাকের পুলিশের সাহায্যে বাড়ানো হয়। বহু ভোটদাতাদের ভোট দিতে দেওয়া হয়না। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগেই ভোটারদের আটকে দেওয়া হয়েছিল, সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোটারদের লাইন ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, অনেক ভোটদাতাদের বলা হয়েছিল তাদের ভোট আগেই 'দেওয়া হয়ে গেছে'; এমনকি শাসক কংগ্রেসের কোনও কোনও সুপরিচিত সমর্থকদেরও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। প্রিসাইডিং অফিসারদের সাহায্য, সমর্থন নিয়ে অথবা তাঁদের জবরদস্তি করে কংগ্রেস, সি. পি. আই.-এর পক্ষে ব্যালট পেপারে ছাপ মেরে ভোট বাড়ানো হয়। যেসব প্রিসাইডিং অফিসার তা করতে অস্বীকার করেছেন তাঁদেরকে হুমকি দেওয়া, এমনকি কার্যত আটক করে রাখা হয়; বামপন্থী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের তাড়ানো অথবা কার্যকলাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্দি হিসাবে আটক রাখা হয়েছিল।[৯৯]

১৮ মার্চ ১৯৭২ সালে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট এক যৌথ বিবৃতি পেশ করে জানিয়ে দেয় তারা জালিয়াতির উপর ভিত্তি করে গঠিত আগামী বিধানসভায় যোগদান করা থেকে বিরত থাকবে। ১৯ মার্চ সি. পি. আই. (এম)-এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি আরও 'কঠিন অগ্নিপরীক্ষা'-এর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়।[১০০]

নকশাল আন্দোলনের পতন :

সংসদীয় রাজনীতির বাইরে যে নকশাল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এবং তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছিল সেই আন্দোলন সাতের দশকের প্রথম পর্বে এসে ব্যর্থতার মুখ দেখে। এর পিছনে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং আন্দোলনের দমনে রাষ্ট্রের অতি-সক্রিয়তা কাজ করেছিল।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে শীর্ষ-নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে অন্যতম দুজন নেতা ছিলেন 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'-র সভাপতি প্রমোদ সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্ত। 'AICCCR' 'নির্বাচন বয়কট'-এর ডাক দিলে প্রমোদ সেনগুপ্ত সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। ফলে তিনি সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসেন।[১০১] সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হলে নকশাল আন্দোলনের নেতারা সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণকে 'সাম্রাজ্যবাদী' আখ্যা দেয়। 'দেশব্রতী' ও 'লিবারেশান' পত্রিকায় এর তীব্র নিন্দা করা হয়। এখানেই পরিমল দাশগুপ্তর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। তিনি মনে করতেন এই আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল।[১০২] কিন্তু তাঁর এই মত প্রত্যাখ্যাত হলে পরিমল দাশগুপ্ত 'AICCCR' পরিত্যাগ করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি 'AICCCR'-এ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'AICCCR' থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে 'AICCCR' তিনটি 'মৌলিক পার্থক্য'-এর কথা বলেছে—প্রথমত, অন্ধ্র কমিটি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই কমিটি শ্রীকাকুলামের সংগ্রামে 'দায়সারা সমর্থন' জ্ঞাপন করেছে, সেভাবে উষ্ণ সমর্থন তারা জানায়নি। তৃতীয়ত, এই কমিটি এখনও 'নির্বাচন বয়কট'-কে রণকৌশল হিসেবে মান্যতা দেয় না।[১০৩]

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে চারু মজুমদার সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দিয়ে 'খতম অভিযান'-কে গণআন্দোলন, গণসংগঠন ও গণপ্রচার থেকে অধিক গুরুত্ব দেন।[১০৪] এই কথার রেশ টেনেই সেই বছর ১৫-১৬ মে সি. পি. আই. (এম., এল.) পার্টি প্রথম অধিবেশনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তাবে 'শ্রেণিশত্রু

খতম'-কে শ্রেণিসংগ্রামের উচ্চ পর্যায় হিসেবে গণ্য করে 'খতমের সংগ্রাম' চালানোর সংকল্প ঘোষণা করে।[১০৫] এই ঘোষণা পার্টির অন্দরে মতবিরোধ ও সমালোচনার ঝড় তোলে। সুশীতল রায়চৌধুরী সেই বছর নভেম্বর মাসে 'Problems and Crisis of Indian Revolution' নামে যে দলিলটি রচনা করেন তাতে নকশাল আন্দোলনে গৃহীত কিছু হঠকারি পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন। এই দলিলে নকশাল আন্দোলনের আদর্শ-বিচ্যুতির দিকটি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই সময় চারু মজুমদার প্রায়ই বলতে থাকেন ১৯৭৫ সালের মধ্যেই বিপ্লবের সাফল্য আসবে।[১০৬] এটি একটি হঠকারি ও আবেগি ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বিপ্লব চালিত না হলে তা ব্যর্থ হয়। শ্রেণিশত্রুরা সর্বদায় সংগঠিত এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ থাকে অসংগঠিত অবস্থায়। সুতরাং প্রথমে তাদের সংগঠিত করে অস্ত্রে সুসজ্জিত করা একান্তই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শ্রেণিশত্রুদের শক্তি ক্রমশ ক্ষয় করতে হবে এবং জনগণের শক্তি বাড়াতে হবে। যা দীর্ঘ সময়ের কার্যক্রম।[১০৭] সেজন্য প্রয়োজন গণআন্দোলন ও গণপ্রচার।

কারা শ্রেণির 'শত্রু' এবং কারা শ্রেণির 'মিত্র'—তা চিহ্নিতকরণ করা বিপ্লবী পার্টির অন্যতম দায়িত্ব। শ্রেণিশত্রুদের আক্রমণ করার পূর্বে শ্রেণিসংগ্রামে আসল মিত্রদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার দিকে পার্টির নজর দেওয়া জরুরি। সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর পার্টি প্রোগ্রামে সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল—শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়ারাই ভারতের অধিক জনসংখ্যা। আর এই সমস্ত জনগণের মধ্যে 'ঐক্যফ্রন্ট' রাতারাতি তৈরি হওয়া সম্ভব না। যখন সশস্ত্র সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য তৈরি হবে এবং অন্ততপক্ষে দেশের কিছু জায়গায় 'লাল ঘাঁটি এলাকা' স্থাপিত হবে তখনই 'ঐক্যফ্রন্ট' গঠন হবে।[১০৮] দীর্ঘ এই প্রক্রিয়ায় পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব পরবর্তীতে ধৈর্য দেখাতে পারেননি। রাজনৈতিক এই লাইন থেকে তারা সরে গিয়ে বলতে থাকেন—'তারা আমাদের সঙ্গে আসতে বাধ্য হবে', 'আমরা তাদের পরোয়া করি না' ইত্যাদি।[১০৯] এমনকি 'খতম অভিযান'-এর শিকার তারাও হত। ফলে অনেক ব্যবসায়ী, শিক্ষক সহ বহু সাধারণ মানুষ মারা যায়।

এই সমস্ত হঠকারিতার কারণে নকশাল আন্দোলনে গেরিলা সংগঠন ও গেরিলা অ্যাকশনের মধ্যেও পদ্ধতিগত ভুল চোখে পড়ে। নকশাল আন্দোলন মূলত ১৯৭০ সাল থেকে হঠকারিতার দোষে দুষ্ট হতে শুরু করে। এর পূর্বে আন্দোলনের গতিতে সেই দোষ সেভাবে ছিল না। সুশীতল রায় চৌধুরী ১৯৬৭, ১৯৬৮ সালের 'দেশব্রতী' পত্রিকার বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তা বিশদ করেছেন। সেই সব লেখালেখি থেকে জানা যায়—গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে আসলে শ্রেণিসংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়, আর শ্রেণিসংগ্রাম হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সমষ্টি। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিক-কৃষককে রাজনীতি সচেতন করে তাদের গণসংগ্রামে উৎসাহী করতে হবে। যাতে তারা সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে রত থাকে। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত মাও সেতুঙ-এর চিন্তা প্রচার করতে হবে। এভাবেই গেরিলা যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে।[১১০] কিন্তু বাস্তবে নকশাল আন্দোলন এভাবে এগোয়নি। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এবং ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে গেরিলা ইউনিট তৈরি করা হয়েছিল। তারপরই গেরিলা অ্যাকশন হিসেবে আঞ্চলিক শ্রেণিশত্রুদের হত্যা করতে শুরু করে।[১১১] এখানেই মাও সেতুঙ-এর চিন্তাধারা থেকে নকশাল আন্দোলনের বিচ্যুতি ঘটে। নকশাল আন্দোলনে 'খতম অভিযান' মানে ছিল শ্রেণিশত্রুদের হত্যা করা। কিন্তু মাও সেতুঙ সে কথা বলেননি। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই 'হত্যা' করার কথা বলেছেন, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে, সবসময় নয়। তাঁর বিশেষ জোর ছিল শ্রেণিশত্রুদের শারীরিকভাবে ধ্বংসের দিকে নয়, বরং তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে ধ্বংস করার দিকে।[১১২]

সুশীতল রায় চৌধুরীর একটি বড়ো অভিযোগ ছিল চারু মজুমদারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের উপর। তিনি একটা সময় পার্টির উপরে চলে গিয়েছিলে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সেতুঙ-এর চিন্তা অনুযায়ী—

> 'The party committee system is an important party institution for ensuring collective leadership and preventing any individual from monopolising of the conduct of affairs.'[১১৩]

কিন্তু 'দেশব্রতী' পত্রিকায় আন্দোলন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি চারু মজুমদারের উপদেশ হিসেবে প্রকাশিত হত। বহু ক্ষেত্রে রাজ্য সম্পাদককেও সে বিষয়ে কিছুই জানানো হত না, সেই পত্রিকা থেকেই জানতে পারতেন। এমনকি রাজ্য কমিটির দেওয়া অনেক নির্দেশ ছাপানো হত না। গণফৌজ গঠনের বিষয়টিও চারু মজুমদারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল। সে সম্পর্কে পার্টি কমিটি, পলিটব্যুরো বা রাজ্য কমিটি কোথাও আলোচনা করা হয়নি।[১১৪] এক সময় চারু মজুমদারের কর্তৃত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাঁকে ভারতের মাও সেতুঙ চিন্তাধারার একমাত্র কর্তৃত্ব হিসেবে দেখানো হত। এর পিছনে কাজ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের কিছু দায়িত্বশীল পার্টি সদস্য। এমনকি যদি কেউ এর বিরোধিতা করত তাহলে তাকে হয় 'সংশোধনবাদী', নয় তো 'মধ্যপন্থী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হত।[১১৫]

নকশাল আন্দোলনের নেতাদের কাছে একটি বড়ো সমস্যা আসে চিন থেকে। পার্টির প্রথম কংগ্রেসের কিছু আগে থেকে নকশাল আন্দোলন নিয়ে চিন সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করছিল। ফলে পার্টির অন্দরে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। সেই আশঙ্কার নিবৃত্তিকরণের জন্য চিনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। ঠিক হয় সুনীতি কুমার ঘোষ, সরোজ দত্ত ও সৌরেন বসু প্রতিনিধি হয়ে চিনে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সৌরেন বসু একাই যান ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে। সৌরেন বসু লন্ডন ও তিরানা হয়ে পিকিং পৌঁছান। ২৯ অক্টোবর চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কাঙ শেঙ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা হয় নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে।[১১৬] ২৯ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এসে চারু মজুমদারের কাছে সৌরেন বসু সেই সাক্ষাৎকারের একটি রিপোর্ট পেশ করেন। যেখানে নকশাল আন্দোলনের লাইন সম্পর্কে চিনের নেতাদের বিরূপ সমালোচনাই ধরা পড়েছে।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে চারু মজুমদার 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের পথ আমাদের পথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন।[১১৭] সি. পি. আই. (এম., এল.)-এর প্রথম অধিবেশনে এটাই শ্লোগান হিসেবে স্বীকৃত হয়।[১১৮] বিপ্লবের এই পন্থাকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করে না। চৌ এন লাই ও কাং সেঙ-এর বক্তব্যে সেই কথাই ধরা পড়েছে। ১৯৫৭ সালে মস্কোতে মাও সেতুঙ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, তিনি পিতৃতান্ত্রিক পার্টির বিরুদ্ধে। কারণ এত বড়ো পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় এক দেশের উপর অন্যদেশের রাজনৈতিক লাইন যান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দিলে

সফলতা আসা সম্ভব না। প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নিজের দেশের অবস্থা অনুযায়ী পার্টি লাইন তৈরি করতে হবে। মাও সেতুঙ সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্ক হবে সৌভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের, মতামত বিনিময়ের। সেখানে কোনও কর্তৃত্ব থাকবে না। সেজন্য চৌ এন-লাই বলেছেন—

> 'কোনও একটি দেশের নেতাকে অন্য একটি দেশের নেতা হিসেবে গণ্য করা সেই দেশের জাতীয় অনুভূতির বিরোধী; শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই বিষয়টি মেনে নেওয়া কঠিন। একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে শ্রদ্ধা করা এক বিষয়। কিন্তু নিজস্ব নেতা হিসেবে গণ্য করা একেবারে ভিন্ন বিষয়। এটা একটা নীতির প্রশ্ন।'[১১৯]

মাও সেতুঙ-এর চিন্তা অনুযায়ী পার্টিকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।[১২০] এ প্রসঙ্গে চৌ এন-লাই চিনের ১৯২৭ সালের আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেছেন। যে আন্দোলন হঠকারিতার শিকার হয়েছিল। তার কোনও গণভিত্তি ছিল না, কেবলমাত্র জোতদারদের খতম করাই ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শাসক শ্রেণিও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।[১২১] কাং শেঙ-ও নকশাল নকশাল আন্দোলনের 'শ্রেণিশত্রু খতম' লাইনটির ঘোর বিরোধিতা করেছেন। চারু মজুমদারের 'ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে এগিয়ে চলুন' (৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯) প্রবন্ধের উল্লেখ করে জানিয়েছেন, এর কিছু কিছু বক্তব্য তারা সমর্থন করেন না। প্রবন্ধে চারু মজুমদার বলেছেন—

> 'গণসংগঠন ও গণ আন্দোলন প্রকাশ্য আন্দোলন ও অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের ঝোঁক বাড়ায়, বিপ্লবী কর্মীদের শত্রুর সামনে খুলে ধরে; ফলে শত্রুর আক্রমণ করা সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠন গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির পদে বাধা স্বরূপ।'[১২২]

কাং শেঙ বলেছেন উলটো কথা অর্থাৎ এগুলোই গেরিলা যুদ্ধের ভিত্তি এবং এদের অনুপস্থিতিই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তিনি তুলে ধরেছেন গেরিলা সংগঠন সম্পর্কে সি.

পি. আই. (এম., এল.) পার্টি নেতৃত্বের ভ্রান্তি। যে গেরিলা সংগঠন জনগণের এবং পার্টি কমিটির কাছে গোপন—তার সংগঠনের চরিত্রটিও বদলে যায়। ফলে তা বিপজ্জনক।[১২৩]

চৌ এন-লাই বলেছেন মাও সেতুঙ-এর মতে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে পার্টির শুদ্ধিকরণ ঘটানো একান্তই প্রয়োজন। পার্টিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব অঞ্চলে সংযোগ গড়ে তুলতে হবে। পার্টি লাইন জনগণের মধ্যে থেকে পরীক্ষিত হবে এবং পার্টি লাইনের ত্রুটিগুলি জনগণের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই সংশোধন করতে হবে। এভাবেই পার্টি লাইনের ক্রমশ উন্নতি ঘটবে।[১২৪]

নকশাল আন্দোলনের গতি থেমে যাওয়ার পিছনে রাষ্ট্রের দমননীতি বিশেষ কাজ করেছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে 'প্রতিরোধ' গোষ্ঠী তৈরি করা হয়। এই গোষ্ঠীগুলিতে মূলত ব্যবহার করা হয়েছিল সমাজবিরোধী গুন্ডাদের। তাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক থাকত এবং ভালো মাসোহারা দেওয়া হত। এদের কাজ ছিল প্রধানত কমিউনিস্টদের হত্যা করা।[১২৫] ১৯৭০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের হিংসাত্মক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট' এবং 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনসান অফ ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট' পাশ হয়, যা পুলিশ-প্রশাসনকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে পরবর্তীতে নকশাল আন্দোলন দমন করতে গিয়ে দেখা যায় গ্রেপ্তারের মিছিল, লাগামছাড়া নির্যাতন, একাধিক হত্যাকাণ্ড।

নকশাল আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ-প্রশাসন এবং সরকারি মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী গুন্ডারা বেশ কয়েকটি গণহত্যা সংগঠিত করে। বারাসাত, বরানগর, কাশীপুর ও সিঁথি অঞ্চলের গণহত্যা নিয়ে আগেই বলা হয়েছে। এই সময় কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলগুলিতে প্রায়ই নকশাল কর্মীদের লাশ পড়ে থাকত। কলেজ স্ট্রিট এলাকায় এক গভীর রাতে পুলিশ চারজন নকশালকে হত্যা করে। অভিযোগ তারা নাকি একটি গলিতে পোস্টার মারছিল এবং তাদের পুলিশ ঘিরে ফেললে পুলিশের উপর তারা বোমা ছোঁড়ে।[১২৬] জেলের ভিতরেও প্রায় নকশালদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধত। সেই সংঘর্ষে অনেক নকশাল হতাহত হত। জেলের ভিতরে মৃতের সংখ্যা প্রায় ২০০ মতো ছিল।[১২৭] যেমন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে সাতজন বন্দি নিহত এবং ৪০

জন আহত হয়,[১২৮] মে মাসে দমদম জেলে ১৬ জন মারা যায় এবং ৮৮ জন আহত হয়।[১২৯]

নকশাল আন্দোলনের গতি একদম থেমে যায় তিন শীর্ষ নেতার মৃত্যুতে। ১৩ মার্চ ১৯৭১ সালে সুশীতল রায়চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ৫ আগস্ট পুলিশ দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়ি থেকে সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে। কিন্তু পুলিশ কোনও দিন স্বীকার করেনি এই অভিযোগ। পুলিশের কাছে তিনি আজও নিখোঁজ।[১৩০] অন্তিমে মারা যান চারু মজুমদার। নকশাল আন্দোলনের বিচ্যুতি শেষপর্যন্ত চারু মজুমদারও অনুভব করতে পেরেছিলেন। ১৪ জুলাই ১৯৭২ সালে তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> 'আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বড় কম হচ্ছে। তার কারণ খতমের উপর বড় বেশী জোর পড়ে গেছে। এটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি। পার্টির মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে, কাজেই সংশোধিত হবে।'[১৩১]

কিন্তু সেই আশা আর পূর্ণ হয়নি। ১৬ জুলাই রাত ভোর হবার আগেই অতর্কিতে পুলিশ গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ১২ দিন পর ২৮ জুলাই লালবাজার থানার লক-আপে তাঁর মৃত্যু হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার রেখেছিল।[১৩২] চারু মজুমদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নকশাল আন্দোলনের রেশ কমে যেতে থাকে খুব দ্রুত। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে যেখানে লেখা থাকত 'চারু মজুমদার যুগ যুগ জিও', সেই শ্লোগানগুলি মুছে লেখা হতে শুরু হল 'ইন্দিরা গান্দী যুগ যুগ জিও'।[১৩৩]

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জামানা :

১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করেছে, নকশাল আন্দোলনের অবসান ঘটেছে; সুতরাং সমস্ত বাধায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সামনে থেকে সরে গেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সময় আশা করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে তা দেখা গেল না। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজের সরকার পরিচালনা

করে সন্ত্রাস ও আধা-ফ্যাসিস্ত রাজনীতির মধ্য দিয়ে। সরকারের মদত পুষ্ট গুন্ডাবাহিনীদের সর্বত্র দাপাদাপি আরও বেড়ে গেল।

জনগণের আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর এই সময় ভয়াবহ আক্রমণ হতে থাকে। পুলিশ অথবা সমাজবিরোধীদের দিয়ে বিভিন্ন সমাবেশ, ধর্মঘট, অবস্থান বিক্ষোভ, আন্দোলন ভন্ডুল করে দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ২ মার্চ বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার পাটুলীতে সি. পি. আই. (এম.)-এর ডাকে এক জনসভা আয়োজিত হলে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসও একই জায়গায় জনসভা ডাকে। ফলে গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শেষ পর্যন্ত সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে তার স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং কাটোয়াতে সি. পি. আই. (এম.)-এর জনসভা আয়োজিত হয়। ২১ এপ্রিল শহীদ দিবস উপলক্ষে কুচবিহারে বিভিন্ন বামপন্থী দলের একটি সম্মিলিত জনসভা আয়োজিত হলে কংগ্রেসি মদতপুষ্ট গুন্ডারা তাতে প্রচণ্ড আক্রমণ হানে। ৩১ অক্টোবর ৯টি বামপন্থী দল একসঙ্গে দুর্গাপুরে একটি জনসভার ডাক দিলে ৩০ অক্টোবর সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ৮ নভেম্বর নদীয়ায় বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে একটি সমাবেশ আয়োজিত হলে কংগ্রেসিরা পথে পথে অবরোধ তৈরি করে। ৩ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে ৯টি বামপন্থী দলের আহ্বানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাটে এক জনসভার আয়োজন হলে প্রথমে কংগ্রেসি গুন্ডারা তাতে আক্রমণ করে এবং পরে পুলিশ সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৪ মে রেল-শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে এবং ১৫ মে সাধারণ ধর্মঘট উপলক্ষে নৈহাটিতে গণ-সংগঠন সমন্বয় কমিটি একটি জনসভা আয়োজন করলে ১৩ মে ১৪৪ ধারা জারি করে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।[১৩৪] কেন্দ্রীয় রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে ১৯৭৩ সাল থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার চরম পর্যায়ে পৌঁছতে থাকে। সেই নিয়ে জনমানসে ক্ষোভের মাত্রা ক্রমশ বাড়ে। সংগঠিত হয় একাধিক গণআন্দোলন। ২৭ জুলাই সেই সূত্রেই রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয় সি. পি. আই. এবং তাতে সি. পি. আই. (এম.) সহ অন্যান্য বিরোধীরা যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসি গুন্ডারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেই ধর্মঘটকে বানচাল করে দেয়।[১৩৫] কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনকে ঘিরেও তৈরি হয় সন্ত্রাস। ১৯৭১ সাল থেকেই এই পরিস্থিতি চলতে থাকে। সশস্ত্র গুন্ডারা পুলিশের সঙ্গে মিলে নির্বাচনের দিন কলেজ চত্বর ঘিরে রাখে। বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতে দেওয়া হয়না। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের

মধ্যে ১০৭টি কলেজে ইউনিয়ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র পরিষদ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।[১৩৬] পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-কারখানাগুলিতেও শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে থাকে। লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং বোনাসের দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে ১৮২টি লক-আউট এবং ৩১ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়।[১৩৭]

এই সময় সারা দেশ জুড়েই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। কেন্দ্রে ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চেপে ধরার প্রয়াস সর্বত্র। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যে পরিচয় পাই পশ্চিমবঙ্গ সেই পথেই হেঁটেছিল। কোনও রকম বিরোধী মতামতকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভা বরদাস্ত করে না। এরকম পরিস্থিতিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেল এক অদ্ভুত চিত্র। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক নাগরিক সম্মেলনে তিন ধারার তিন নেতা এক মঞ্চে উপস্থিত হলেন—সি. পি. আই. (এম.)-এর জ্যোতি বসু, সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং জনসঙ্ঘ দলের নেতা হরিপদ ভারতী এক মঞ্চে বক্তৃতা দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন সেখানে বলেন—

> ‘অর্থনৈতিক প্রশ্নে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি না। উনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী আর আমি গান্ধীবাদে। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কাজ করবো। জ্যোতিবাবু, ত্রিদিববাবুদের সভা করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভলান্টিয়ারী করবো। তিনি জানতে চান কেন রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের পল্লীতে যেতে পারবেন না? কেন শাসকদলের গুণ্ডারা জনসভা ভেঙে দেবে? কেনই বা ভোটের নামে প্রহসন চলবে?’[১৩৮]

জ্যোতিবসু বলেন—

> ‘আমাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে। কিন্তু শাসকদল ও সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে হরণ করেছে, তাতে চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবো, কথা বলার জন্য লড়াই করবো।’[১৩৯]

মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও তারা প্রত্যেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নে এক মত হতে পেরেছিলেন। যা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে প্রশ্নচিহ্নে দাঁড়িয়েছিল।

দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হলে সন্ত্রাসের মাত্রা সমগ্র দেশেই প্রবল হয়ে উঠে। এ বিষয়ে প্রথম পরিচ্ছেদেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ই সর্বপ্রথম ৮ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে চিঠি মারফত দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১৪০] গ্রেপ্তার, সেন্সারশিপের কড়াকড়ি, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি ছিল জরুরি অবস্থার বাস্তব সত্য। ১ আগস্ট ১৯৭৬ সালের মধ্যেই কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৪,৩০১ জনকে 'মিসা' আইনের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৪১] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সি. পি. আই. (এম.)-এর জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিনয় চৌধুরী প্রমুখ কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি।[১৪২] পশ্চিমবঙ্গে বরিষ্ঠ চার সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়—গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় দত্ত ও নিশীথ দে। গৌরকিশোর ঘোষ জরুরি অবস্থা, একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের অবলুপ্তির ঘোরতর বিরোধিতা করেন। এর জন্য তিনি মাথা মুড়িয়ে ছিলেন, একাধিক লেখা-লেখিতে জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। সেজন্যই তিনি গ্রেপ্তার হন। জ্যোতির্ময় দত্তকে গ্রেপ্তার করার মূল কারণ তাঁর নিজের সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার 'বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা' প্রকাশ করা। যেটি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ছিল এবং এর সম্পাদকীয়তে জরুরি অবস্থার অত্যন্ত কড়া সমালোচনা করেন, এখানে গৌরকিশোর ঘোষের 'রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা', 'পিতার পত্র' লেখাগুলি ছিল। 'রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা'-তে গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছিলেন—

> 'এই অবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। চাটুকারের দল আজ ইন্দিরাকে দেশের আইন, কংগ্রেস দল, এমন কি ভারতের সবচেয়ে বড় বলে জাহির করতে শুরু করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়ার বিদুষক-জনোচিত সংলাপ 'ইন্দিরাই ইন্‌ডিয়া' গোপাল ভাঁড়কেও হার মানিয়েছে।
>
> এই সব গো-পালের জন্য ইন্দিরাও আজ একদিকে যেমন হাস্যাস্পদ অন্যদিকে তেমনি করুণার পাত্রী হয়ে উঠেছেন।'[১৪৩]

নিশীথ দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার একজন সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর বই লেখার শখ ছিল। তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবনী লিখেছিলেন। সেটার জন্যই তাঁকে গ্রেপ্তার করা

হয়। তবে পুলিশ তাঁকে কেবল গ্রেপ্তারই করেনি, বাড়ি থেকে কোমরে দড়ি বেঁধে থানা পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।[১৪৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও গানের উপরেও সেন্সর চাপে। ২৭ জুন 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতার ইংরেজি তর্জমা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপলে সেন্সর জেগে ওঠে। এই কবিতা পুনের 'সাধনা' পত্রিকায় মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করে বার হলে সেই পত্রিকাকে সেন্সর নোটিশ পাঠায়। আকাশবাণী থেকে সেন্সর করা রবীন্দ্র সংগীতের একটি তালিকা দেওয়া হয় যেগুলি সেন্সর করা হয়েছে। নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানের উপরেও সেন্সর চাপে।[১৪৫]

অবশেষে জরুরি অবস্থার অবসান ঘটলে কেন্দ্রে যেমন রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই ঘটেছিল। ১৯৭৭ সালের ১১ ও ১৪ জুন ভোট হলে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয় লাভ করে, সি. পি. আই. (এম.) একাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই. (এম.) ক্ষমতায় থাকে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায়। এর পিছনে সাতের দশকের ভয়াবহ পরিস্থিতি যে কাজ করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০২, পৃ-১৯২

২. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-৯৭

৩. তদেব, পৃ-৯৬

৪. সেনগুপ্ত, বরুণ; *পালা বদলের পালা*, রচনা সংগ্রহ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ-১৭১

৫. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২০১

৬. দাশগুপ্ত, বাসব; *যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবাংলা*, প্রকাশক-বাসব দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৭২ পৃ-১২

৭. সেনগুপ্ত, বরুণ; *পালা বদলের পালা*, প্রাগুক্ত, পৃ-২১

৮. ঘোষ, সুনীতি কুমার; *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১০, পৃ-২৫৮

৯. সেন, সুকোমল; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-২০১০*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ-৪০৯

১০. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১০১

১১. সেনগুপ্ত, বরুণ; *পালা বদলের পালা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭১

১২. তদেব, পৃ-১৭২

১৩. বসু, প্রদীপ; *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ : কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, পৃ-২৮-২৯

১৪. Banerjee, Sumanta; *India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising*, Zed Books Ltd, 1984, London, P-82-84

১৫. বসু, প্রদীপ; *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ: কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা,* প্রাগুক্ত-২৫

১৬. মজুমদার, চারু; *বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২১

১৭. মজুমদার, চারু; *শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল ক'রে তুলুন,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২২

১৮. মজুমদার, চারু; *আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৩৫

১৯. মজুমদার, চারু; *১৯৬৫ সাল কী সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে?,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৩৭

২০. মজুমদার, চারু; *সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই এখনকার প্রধান কাজ,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৪৪

২১. মজুমদার, চারু; *সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলুন,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৪৬-৪৭

২২. মজুমদার, চারু; *সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে,* সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ,

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৫২

২৩. বসু, প্রদীপ; *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ : কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা*, প্রাগুক্ত-৬৯

২৪. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ-৯৯

২৫. তদেব, পৃ-১০৫

২৬. Banerjee, Sumanta; *India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising*, Zed Books Ltd, 1984, London, P-৮৬

২৭. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮

২৮. তদেব, পৃ-১০৮

২৯. তদেব, পৃ-১১১

৩০. তদেব, পৃ-১১২

৩১. ভট্টাচার্য, অমর; *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন*, নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ-৭৩

৩২. চট্টোপাধ্যায়, অসীম; *নকশালবাড়িনামা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১১১

৩৩. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪

৩৪. Banerjee, Sumanta; *India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising*, প্রাগুক্ত, Page-89

৩৫. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫

৩৬. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮-১০৯

৩৭. Sen, Samar etc. (edited); *Spiring Thunder over India*, Naxalbari and After a Frontier Anthology, Vol-1, Kathashilpa, Kolkata, December 1978, Page-190

৩৮. তদেব, পৃ-১৯২

৩৯. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫

৪০. Banerjee, Sumanta; *India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising*, প্রাগুক্ত, Page-৯৭

৪১. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.), *কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির তিনটি দলিল*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২৮১

৪২. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক*, তৃতীয় পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২, পৃ-৮৬

৪৩. তদেব, পৃ-৮৮

৪৪. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৭

৪৫. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২০৪

৪৬. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫

৪৭. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক*, তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-৯১

৪৮. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২০৭

৪৯. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.); *নির্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাব*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২৮৬-২৮৭

৫০. মজুমদার, চারু; *'নির্বাচন বয়কট করো' শ্লোগানের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য*, রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায়(সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১০১

৫১. সেনগুপ্ত, বরুণ; *পালা বদলের পালা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৪

৫২. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮

৫৩. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২২০

৫৪. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯

৫৫. সেনগুপ্ত, বরুণ; *পালা বদলের পালা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৩

৫৬. তদেব, পৃ-১১৭

৫৭. তদেব, পৃ-১৩২

৫৮. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৩

৫৯. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক*, তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮

৬০. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.); *কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির তিনটি দলিল*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২৮৩

৬১. Sen, Samar etc. (edited); *It is Time to Form the Party*, Naxalbari and After a Frontier Anthology, Vol-1, Kathashilpa, Kolkata, December 1978, Page-229

৬২. Sanyal, Kanu; *Report on the Peasant Movement in the Tarai Region*, Naxalbari and After a Frontier Anthology, Vol-1 Samar Sen etc. (editor), Kathashilpa, Kolkata, December 1978, Page-219

৬৩. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪০

৬৪. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.); *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদ)'র রাজনৈতিক প্রস্তাব*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-২৯৬

৬৫. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪১

৬৬. তদেব, পৃ-১৪২

৬৭. তদেব, পৃ-১৪২

৬৮. মজুমদার, চারু; *ছাত্র যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায়(সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১২২

৬৯. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪২

৭০. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৪

৭১. তদেব, পৃ-১৭৮

৭২. মজুমদার, চারু; *'৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায়(সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১৬৫

৭৩. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২১২

৭৪. তদেব, পৃ-২২৪

৭৫. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক* (তৃতীয় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৯

৭৬. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৯

৭৭. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৯

৭৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২০৫

৭৯. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১

৮০. গণশক্তি-৫.১১.১৯৭০

৮১. তদেব, পৃ-২২২

৮২. দাস, অরূপ কুমার (সং. ও সম্পা.); *গণযুগের দিনপঞ্জি (১৯৬০-১৯৭৯),* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০০২, পৃ-২৯

৮৩. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৩২

৮৪. তদেব, পৃ-২৩৪

৮৫. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫

৮৬. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক,* তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-১২১

৮৭. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ-২২৭

৮৮. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক,* তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-১২২-১২৩

৮৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ-২২৯

৯০. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৯

৯১. তদেব, পৃ-২৩৭

৯২. তদেব, পৃ-২৪৩

৯৩. নিয়োগী, রুণু গুহ; *সাদা আমি কালো আমি,* প্রথম খণ্ড, জিনিয়া পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ-১৪৯

৯৪. তদেব, পৃ-১৬৬

৯৫. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৫২

৯৬. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৫০

৯৭. বসু, জ্যোতি; *যতদূর মনে পড়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৫

৯৮. তদেব, পৃ-২৫৭

৯৯. বসু, বিমান (সম্পা.); *পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রহসন*, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬, পৃ-৭৫-৭৬

১০০. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৭

১০১. ঘোষ, সুনীতি কুমার; *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৪

১০২. তদেব, পৃ-২০০

১০৩. তদেব, পৃ-২০৯-২১০

১০৪. মজুমদার, চারু; *'৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন,* চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১৬৫

১০৫. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.); *শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করব*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-৩০১-৩০২ (পরিশিষ্ঠ-৩)

১০৬. বসু, সৌরেন; *চারু মজুমদারের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯

১০৭. Roy, Chowdhury; Sushital; *Problems and Crisis of Indian Revolution*, Samar Sen etc. (edited), Debabrata Panda, Ashish Lahiri, Naxalbari and After: A Frontier Antology, Vol-2, Kathashilpa, Kolkata, 1978, Page-300

১০৮. তদেব, পৃ-৩০৯

১০৯. তদেব, পৃ-৩০১

১১০. তদেব, পৃ-৩০৩

১১১. তদেব, পৃ-৩০৪

১১২. তদেব, পৃ-৩০৪

১১৩. তদেব, পৃ-৩০৮

১১৪. তদেব, পৃ-৩০৮

১১৫. তদেব, পৃ-৩০৯-৩১০

১১৬. ঘোষ, সুনীতি কুমার; *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৩

১১৭. মজুমদার, চারু; *চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান চীনের পথ আমাদের পথ*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১৩৮

১১৮. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন (সম্পা.); *শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করব*, মজুমদার রচনা সংগ্রহ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০১

১১৯. সৌরেন, বসু, কমরেড চৌ এন-লাই এবং কাং শেং-এর আমাদের পার্টির লাইন সম্পর্কে বক্তব্য, সুনীতি কুমার ঘোষ, নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮২ (পরিশিষ্ট-খ)

১২০. তদেব, পৃ-৩৮২

১২১. তদেব, পৃ-৩৮৩

১২২. মজুমদার, চারু; *ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন জোরে এগিয়ে চলুন*, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, সুশোভন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ-১৪৭

১২৩. বসু, সৌরেন; *কমরেড চৌ এন-লাই এবং কাং শেং-এর আমাদের পার্টির লাইন সম্পর্কে বক্তব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৬

১২৪. তদেব, পৃ-৩৮৪

১২৫. ঘোষ, সুনীতি কুমার; *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩২২

১২৬. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক*, তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-২১২

১২৭. তদেব, পৃ-২১৩

১২৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৭

১২৯. তদেব, পৃ-২৪৫

১৩০. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক,* তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮-১৩৯

১৩১. নিয়োগী, রুণু গুহ; *সাদা আমি কালো আমি,* প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৫

১৩২. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশত,* তৃতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৮

১৩৩. তদেব, পৃ-২৪৩

১৩৪. দাশগুপ্ত, প্রমোদ; *রাজ্যব্যাপী গণ আন্দোলন*, বিমান বসু (সম্পা.), বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-১৮০-১৮১

১৩৫. বসু, বিমান (সম্পা.); *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৪০৪

১৩৬. দাশগুপ্ত, প্রমোদ; *রাজ্যব্যাপী গণ আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৭

১৩৭. সেন, সুকোমল; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪০

১৩৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭২

১৩৯. তদেব, পৃ-২৭২

১৪০. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, Penguin Books, India, 2016, Page-5

১৪১. দাস, অরূপ কুমার (সং. ও সম্পা.); *গণযুগের দিনপঞ্জি (১৯৬০-১৯৭৯),* প্রাগুক্ত, পৃ-৮৭

১৪২. বসু, সজল; *জরুরি অবস্থা : আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, মে ২০২২, পৃ-৫০

১৪৩. ঘোষ, গৌরকিশোর; *রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা,* জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পা.), কলকাতা পত্রিকা, বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা-বর্ষা ১৯৭৫ ও বসন্ত ১৯৭৭, কলকাতা, প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, পৃ-৪১-৪২

১৪৪. ভট্টাচার্য, শংকর; *হস্তান্তর : স্বাধীনতার অর্ধশতক,* তৃতীয় পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২, পৃ-৩০৬

১৪৫. বসু, সজল; *জরুরি অবস্থা : আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬